৭|১৫

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দত্ত
করকমলে।

শ্রীযোগানন্দ।
22|৭|১৯৫১

Presented by
Sri Manomohan Datta
Gurudham, Varanasi
on . 16.4.74

মাতৃ-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী

ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী

[শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্র-সঞ্চয়ন]

শ্রীযোগানন্দ ও শ্রীগণেশ
কর্তৃক
সঙ্কলিত।

প্রকাশক :
শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়
মাতৃভাণ্ডার-গ্রন্থালয়
৫৭-২ সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য— তিন টাকা।

মুদ্রাকার :
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
নবীন প্রেস
৬, কলেজ রো, কলিকাতা।

নিবেদন
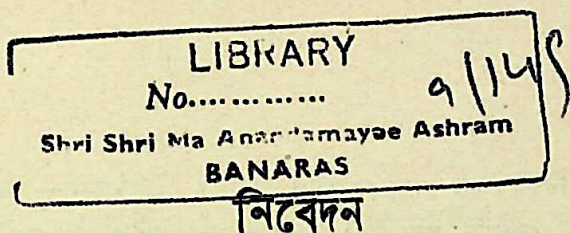
যৌবনের প্রথমপাদে যাঁহার পদাশ্রয় লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইয়াছে, যাঁহার উদাত্ত বাণী সত্যের সন্ধানে প্রাণ মন উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, যাঁহার কঠোর অনুশাসন ও অনুপম স্নেহোপদেশ বহির্মুখী চঞ্চল মনকে শান্ত সমাহিত করিয়া ভগবৎ রসাস্বাদনে উন্মুখ করিয়াছে, তাঁহারই শাশ্বত কথামৃত—যাহা পত্রাকারে বিচ্ছিন্ন ছিল, গ্রন্থাকারে গ্রথিত করিবার পূর্ব্বে এই সত্যদ্রষ্টা সিদ্ধমহাপুরুষ শ্রীমদ্‌গুরুদেব শ্রীশ্রীভারত ব্রহ্মচারীবাবার উদ্দেশে অন্তরের ভক্তি প্রণতি নিবেদন করিতেছি।

শ্রীমৎব্রহ্মচারী বাবার হৃদয় ছিল বজ্রের চেয়েও কঠোর। নিজ জীবনে সাধন ভজন, সেবা পূজা, কথাবার্ত্তা, আচার আচরণে তিনি ছিলেন এরূপ কঠোর সত্যাশ্রয়ী যে, কোন গৃহীর জীবনে তাহা অনুসরণ করা তো অসম্ভব বটেই—একনিষ্ঠ সাধকগণের জীবনেও কদাচিৎ সম্ভবপর হয়। কিন্তু তাঁহার বজ্র-কঠোর সাধক-হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবাহিত ছিল স্নেহ-করুণায় বিগলিত শাশ্বত শান্তির পূত মন্দাকিনী-ধারা। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুমুক্ষু যেমন পাইয়াছে তাঁহার নিকট পরমার্থের সন্ধান, ত্রিতাপ-জ্বালা-বিদগ্ধ সংসারীজনগণও তাঁহার কৃপা-স্পর্শে তেমনি লাভ করিয়াছে অনাবিল শান্তির অমৃত-নির্ঝরিণী। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে তিনি ছিলেন সকলের পরমাত্মীয়—দীন দুঃখীর ছিলেন একান্ত আপনার জন। তাঁহার অগণিত শিষ্যবৃন্দ ব্যতীত বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রায় দশ সহস্র লোক, যাহারা তাঁহার পুণ্যময় সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই আজ ইহা অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিতেছেন।

নানা কার্যোপলক্ষ্যে ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার শিষ্য, ভক্তবৃন্দ বা অন্যান্য

ব্যক্তির নিকট সময় সময় যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখিয়াছেন—'পত্রাবলী' তাহারই একখানি সঞ্চয়নী। ৺অজপানন্দ, সুধীরানন্দ, সুশীলানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতাগণের সংগৃহীত কতকগুলি পত্র গুরুদেবের অন্যতম ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র পত্রনবীশ বিগত ১৩৩০ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এই গ্রন্থে পূর্ব্ব প্রকাশিত পত্রাদি ব্যতীত গুরুভ্রাতা সিংরৈল নিবাসী শ্রীযুক্তযামিনীকান্ত করবর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত আরো কতকগুলি মূল্যবান্ চিঠি সন্নিবেশিত হইল। তাঁহার এইরূপ সযত্ন প্রচেষ্টার জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তত্ত্বমসি, সোঽহং, বন্ধন, মুক্তি, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত জটিল অধ্যাত্মতত্ত্ব এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে আলোচিত হইয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণের নিকট বিনীত অনুরোধ, সে সমস্ত স্থল যেন তাঁহারা বিশেষ অবহিত চিত্তে পাঠ করেন। পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট 'কর্ত্তব্যোপদেশ' ও 'সন্ন্যাসীদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য' শীর্ষক অধ্যায় দুইটি তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুমুক্ষুদিগকে অধ্যাত্ম জ্ঞানদানে সবিশেষ সহায়তা করিবে আশাকরি।

এই গ্রন্থখানির সমুদয় প্রুফ্ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং গ্রন্থ-প্রকাশ কার্য্যের সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন আমাদের অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়। গুরুদেবের কার্য্যে গুরুভ্রাতার এরূপ আন্তরিকতায় আমরা আনন্দ বোধকরি এবং তাঁহাকে আমাদের অন্তরের প্রীতি ভালবাসা নিবেদন করি।

সর্ব্বোপরি যাহাদের অর্থানুকূল্য এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাদিগকে উৎসাহিত ও সক্ষম করিয়াছে, ভগবৎ কৃপালব্ধ আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্তহেরম্ব মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত বিজনলাল মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত দেবীদাস রায় প্রমুখ সুধীবৃন্দের প্রতি আনন্দের সহিত আমাদের সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

গুরুভ্রাতাগণের কাহারো কাহারো আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহে এই গ্রন্থের পুরোভাগে শ্রীমৎব্রহ্মচারীবাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত করা হইল। তাঁহার জীবনে এত অসংখ্য ঘটনাবলীর সমাবেশ হইয়াছিল, যাহা এই স্বল্প কলেবর পুস্তকে সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর নহে। এজন্য অতঃপর ব্রহ্মচারীবাবার একখানি বিস্তৃত জীবনীগ্রন্থ প্রণয়নের সঙ্কল্প রহিয়াছে, এবং গুরুভ্রাতাগণকে ঠাকুরের সম্বন্ধে নিজ নিজ জ্ঞান ও তথ্যাদি যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া—"শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়, ৫৭।২ সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,"—এই ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম,
পণ্ডিচেরী।
দোল-পূর্ণিমা, ১৩৫৭

বিনীত নিবেদক—
শ্রীযোগানন্দ ও শ্রীগণেশ
যুগ্ম-সঙ্কলক।

ওঁ

শ্রীশ্রীমাতা ৺ভারতেশ্বরী মহাদেবীর

ধ্যান

ওঁ সিংহস্থার্দ্ধ-পদ্মাসীনাং রত্নালঙ্কারভূষিতাং।
রক্তাম্বরপরিধানাং শ্বেত-কিরীট-শোভিতাং॥

ত্রিনয়নীং দ্বিভুজাঞ্চ স্মিত-চারু-চন্দ্রাননাং।
অভয়-কর্ত্তরী-করাং নীলাকাশ-সমপ্রভাং॥

সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশিনীং সর্ব্ব-মঙ্গল-কারিণীং।
মহাজ্যোতিঃ মহাশক্তিং ধ্যায়েত্বমাং মহেশ্বরীং॥
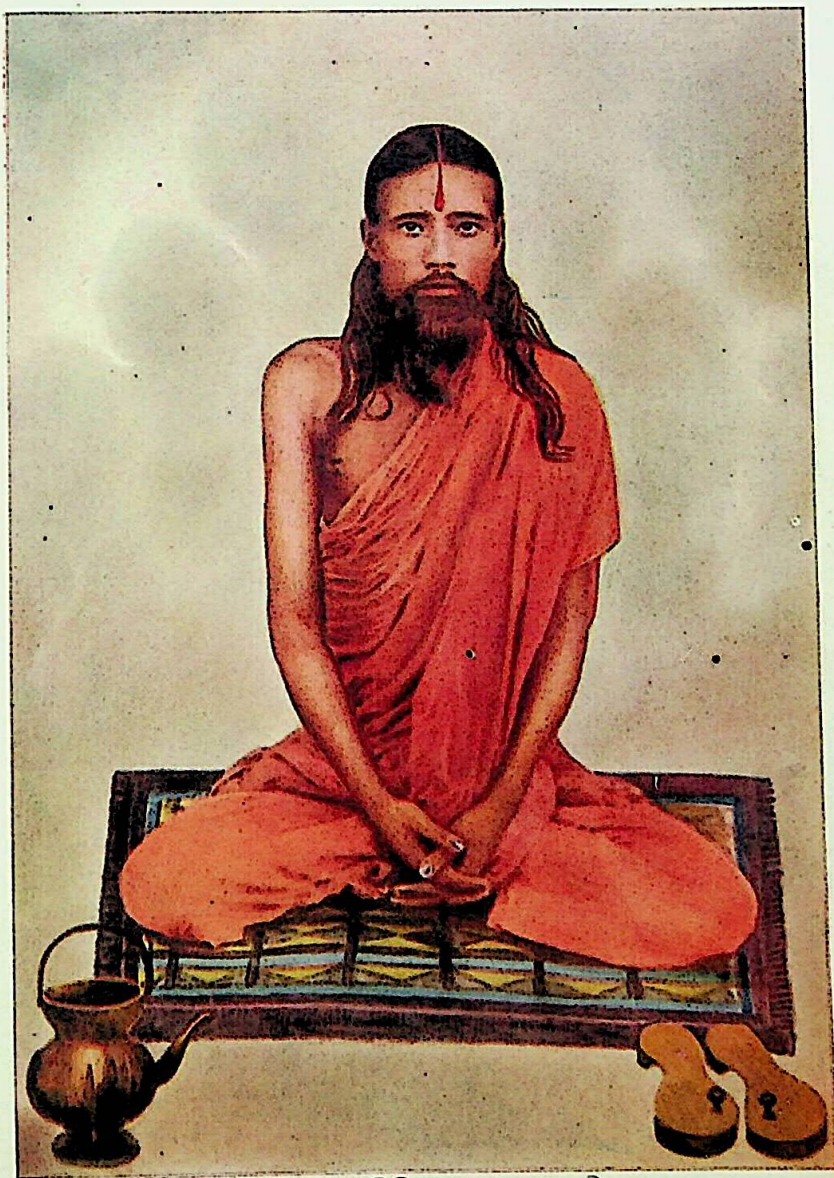
সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীমদ্‌ভারত ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী

শ্রীশ্রীমৎভারত ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী

আবির্ভাব—১২৮১ সনের ১২ই শ্রাবণ ; ইং ১৮৭৪, ২৭শে জুলাই।

তিরোভাব—১৩৩৩ সনের ২৮শে ভাদ্র ; ইং ১৯২৬, ১৪ই সেপ্টেম্বর।

Remained 52 years 6 months 28 days.

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমা সহরের অনতিদূরবর্ত্তী জগদল গ্রামে কায়স্থ বংশীয় রামরতন দেব নামে একজন অতি ধর্ম্মপরায়ণ মধ্যবিত্ত সদ্ গৃহস্থের বাসছিল। তাঁহার পত্নীর নাম দীনমণি দেবী। দীনমণির মাতা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত স্বপ্নাদেশ অনুসারে দম্পতি-যুগল পুত্র কামনায় প্রতি শারদীয়া মহাষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া প্রার্থনাদি করিতেন। এইরূপে তিন বৎসর অতীত হইলে 'নিত্যময়ী' নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

১৩৩৩ সনে "সোনার-ভারত" পত্রিকার মহাপ্রয়াণ সংখ্যাতে স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার ধর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী কর্ত্তৃক লিখিত এবং পরে ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমবাসী যোগানন্দ ও কেদার (কুমুদানন্দ) কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও পরিবর্দ্ধিত শ্রীশ্রীমৎভারত ব্রহ্মচারীবাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

দীনমণি একজন উচ্চশ্রেণীর সাধিকা ছিলেন। তিনি সৎপুত্র কামনায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতে করিতে স্বপ্নে চন্দ্রদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রদেব তাঁহাকে 'দোহাই চন্দ্র' নামে আরাধনা করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন যে, "আরাধনার চিহ্নস্বরূপ গলায় 'ধরা' ধারণ পূর্ব্বক গলবস্ত্র থাকিয়া সাধনা করিতে থাক, আমি আসিব।" ইহার পর হইতেই দীনমণি বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইতেন। মেয়ের জন্মের পর হইতে এই প্রকার সাধনায় ছয় বৎসর অতিবাহিত হইলে উপরোক্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাদশ মাসে ভূমিষ্ঠ হন এবং কথিত আছে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি মাতৃগর্ভে পদ্মাসনে অবস্থিত ছিলেন।

শিশুকালেই তাঁহার সুকোমল হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। একটি মাটির গড়া শালগ্রাম তাঁহার খেলার সামগ্রী ছিল। তিনি এই শালগ্রাম পূজা করিয়া মায়ের নিকট আবদার করতঃ অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোগ প্রদান করিতেন। প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র নাগ মহাশয় তখন বালক সুলভ কৌতুহল বশতঃ খেলার ছলে এই শালগ্রাম লুকাইয়া রাখিলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন।

ক্রমে ছয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। একমাত্র ছেলে, খুবই আদরের ছিলেন। স্কুলে যাইবার সময় মা তাঁহাকে কাপড় পরাইয়া চাদরখানি গলায় দিয়া হাতে পুঁথি, পাত-তাড়ি দোয়াত কলম তুলিয়া দিলে তিনি স্কুলে যাইতেন। স্কুল হইতে

আসিয়াও তিনি এইভাবেই দাঁড়াইয়া থাকিতেন, মা আসিয়া তাঁহার হাত হইতে পুঁথি-পাতা, দোয়াত কলম এবং গলার চাদরখানি নামাইয়া লইয়া ভাত খাইতে দিতেন। বালকের এই প্রকার নিরীহ প্রকৃতি দেখিয়া পিতা মাতার মনে বড়ই ভয় হইত যে, পাছে ছেলেটি 'হাবা' হয়। স্কুলে যতটুকু লেখাপড়া করিয়াছিলেন তাহাতে যথেষ্ট ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। যেদিন শিক্ষক মহাশয় ছেলেদিগকে ভাগ অঙ্ক শিক্ষা দিবেন, ভূমিকায় তিনি বলিতেছিলেন,—তোমরা যোগ, বিয়োগ ও গুণন শিক্ষা করিয়াছ, অদ্য তোমাদিগকে ভাগ শিক্ষা দিব। শিক্ষক মহাশয়ের এই কথাগুলি বালক ভারত তন্ময়ভাবে শুনিতেছিলেন। কি জানি কেন আপন মনে শিক্ষক মহাশয়ের বাক্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—'যোগ, বিয়োগ ও গুণন শিক্ষা করিয়াছি, এখন আবার ভাগও শিক্ষা করিতে হইবে?' ইহাতে সহপাঠিগণ সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলে তিনি লজ্জিত হইলেন, এবং ঐদিন হইতেই পাঠশালার পড়া সমাপ্ত করিলেন।

গুরুর উপদেশ না পাইয়াও গোপনে আজ্ঞাচক্রে ধ্যান ও আসন ইত্যাদি অভ্যাস করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের নাম বা বীজমন্ত্র প্রাপ্ত না হওয়ায় কখনও বা একপদে দাঁড়াইয়া, কখনও শ্বাস বন্ধ করিয়া, কখনও বা উর্দ্ধপদে "বাবা" নাম জপ এবং ধূপদীপ ও পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা অমন্ত্রক পূজাদি করিতেন। এইরূপে বাল্যকাল হইতেই ভগবৎ সাধনায় একান্ত তন্ময় হইয়া পড়ায় বিদ্যালয়ের লেখাপড়ায় তিনি আর

মনোযোগ দিতে পারিলেন না।

১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৫ই মাঘ তাঁহার পিতৃদেব সজ্ঞানে হরেকৃষ্ণ, শিবদুর্গা ইত্যাদি নাম স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। এইসময়ে তাঁহার বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর ছয় মাস। পিতৃবিয়োগের পর মা, বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও দুইটি ভাগিনেয়ীর প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর পড়ে। তিনি সামান্য আয়ে সামান্য ব্যয়ে ইহাদের ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। এই বয়সেই একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অম্বুবাচী ইত্যাদি উপলক্ষ্যে উপবাসাদি, এবং আহার কমাইবার চেষ্টায় বায়ুপান করিয়া উদর পূরণ করিতেন।

এই সময়ে গ্রামের শবদাহ করিতে তাঁহাকে খুব উৎসাহিত দেখা যাইত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিছু আহারাদি করিয়া একটি দা হাতে করিয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়িতেন এবং আশেপাশে তিন চারি মাইলের ভিতরে কোথাও মৃতের সংবাদ পাইলে সেখানে উপস্থিত হইয়া যথাবিহিত সৎকার করিয়া কোনদিন বৈকালে কোনদিন বা রাত্রিতে বাড়ীতে ফিরিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের গ্রামে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তিন দিন যাবৎ অচৈতন্যাবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। আত্মীয়স্বজন সকলে বিষন্নভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা বৃদ্ধার মলমূত্র পূর্ণ বিছানা পরিবর্ত্তন করা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। এমন সময় ব্রহ্মচারীবাবা তথায় উপস্থিত হইয়া মুমূর্ষু বৃদ্ধার শরীর ধৌত

করিয়া মলমূত্র মাখা বিছানা হইতে বৃদ্ধাকে পরিষ্কার বিছানায় শোয়াইলে সকলে বলিতে লাগিলেন যে, এই অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগায় বৃদ্ধা মরিয়া যাইবে। ইহাতে ব্রহ্মচারী বাবা বলিয়াছিলেন যে, "পরিষ্কার না করিলে মরিবে না?" বিছানা পরিবর্ত্তন করার কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তিনি মৃতার সৎকার করিয়া বৈকালে বাড়ীতে ফিরিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার শবদাহের উৎসাহ আর তেমন দেখা যাইতনা।

পিতৃবিয়োগের পর এক বৎসরের মধ্যেই ময়মনসিংহ সদর মহকুমার অন্তর্গত উস্থি গ্রাম নিবাসী শুদ্ধশান্ত স্বভাব শ্রীমৎশিবকান্ত তর্কলঙ্কার মহোদয়কে শিবতুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট "রাম" মন্ত্রে দীক্ষিত হন। অল্পকাল পরেই শ্রীমৎ তর্কলঙ্কার মহোদয়ের স্বর্গলাভ হইলে, জগদলের নিকটবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্রপট্টি নিবাসী ভট্টাচার্য্য বংশীয় জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ অভয়াচরণ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের নিকট ব্রহ্মগায়ত্রী ও সোঽহং মন্ত্রে (১) দীক্ষা গ্রহণ করেন। উক্ত ব্রহ্মচারী মহোদয় বারদীর প্রাতঃস্মরণীয় শিবতুল্য শ্রীশ্রীমৎলোকনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের মন্ত্রশিষ্য। অল্পকাল পরে হরিশ্চন্দ্রপট্টির ব্রহ্মচারী মহোদয়ও দেহরক্ষা করিলেন। তখন তাঁহার সাধনার অবস্থায় অনুভব করিতেন, কে যেন তাঁহার আশে পাশে

---

(১) শ্রীশ্রীমৎলোকনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের শিষ্য হইতে সন্ন্যাস মন্ত্র (সোঽহং) গ্রহণ করায় তিনিও গুপ্ত পরিচয় সূচক "ব্রহ্মচারী" আখ্যায় অভিহিত হইতেন।

ঘুরিয়া বেড়াইত, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ কিছু দেখিতে পাইতেন না; এজন্য মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিতেন। একদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে মাঠের প্রান্তে বসিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার স্বগ্রামবাসী শ্রীমৎ গোপালচন্দ্র গোস্বামী (দত্ত) গাভীটিকে মাঠে চড়িতে দিবার জন্য আসিয়া ব্রহ্মচারীবাবাকে একাকী দেখিতে পাইয়া আপন মনে গাহিতে লাগিলেন—"স্কুলে তো সবাই গো পড়ে, দয়াল গুরুর ইস্কুলে," ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার মুখে এই গূঢ়ার্থসূচক গানের পদটি শুনিতে পাইয়া গানটি আবার তাঁহাকে গাহিতে বলিলেন। গোস্বামী মহোদয় ব্রহ্মচারীবাবাকে কাছে ডাকিয়া ঐখানেই কলাপাতায় ছিক্ দিয়া গানটি লিখিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা পরে গুপ্ত সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ শ্রীমৎ গোপাল গোস্বামী মহোদয়ের আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার নিকট হইতে তারকব্রহ্ম নামের বীজমন্ত্রে দীক্ষালাভ করেন। শ্রীমৎ গোপাল গোস্বামী ব্রহ্মচারী বাবাকে উপদেশ দিলেন যে, "তুমি তামার টাটে চন্দন দ্বারা প্রণব লিখিয়া প্রত্যহ পাঁচটি তুলসী পত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবে এবং মধ্য রাত্রিতে প্রণব ধ্বনি করিয়া শ্রীভগবানকে আহ্বান করিবে।" প্রণব ধ্বনিতে শ্রীভগবানকে আহ্বান করিবার কৌশলও তিনি তাঁহাকে শিখাইয়া দিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা শ্রীমৎগোস্বামীর উপদেশ অনুসারে সাধনা আরম্ভ করিলেন; কিন্তু গোপাল গোস্বামী মহোদয়ও অল্পকাল মধ্যে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার উপদেশ মত আড়াই বৎসর সাধনার পর, একদিন গভীর রাত্রিতে

তুলসী তলায় বসিয়া যখন প্রণবধ্বনি করিয়া শ্রীভগবানকে আহ্বান করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে, সমস্ত আকাশ আলোকিত করিয়া একটি দিব্য জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়াছে। আহ্বান বন্ধ রাখিয়া তিনি ঐ জ্যোতিটি দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, আকাশব্যাপী ঐ বিরাট জ্যোতি ক্রমশঃ ছোট হইতে হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছে, এবং ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া সম্মুখস্থ তুলসী তলায় অবস্থিত তামার টাটে লিখিত প্রণবে মিলাইয়া গেল। এই জ্যোতি দর্শনের পর হইতেই ক্রমে স্বপ্নাদেশে সাধনার ইঙ্গিত পাইতে আরম্ভ করিলেন ; এবং স্বপ্নাদেশের ইঙ্গিতে সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ বাক্যাদেশ পাইতে থাকেন। কিছুকাল বাক্যাদেশ লাভের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যে কথা বল, তুমি কে ?" উত্তর আসিল, "আমি তোর বাবা," এবং পরে এই "বাবা"-ই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন দেন।

তাঁহাদের বাড়ীতে একটি বিষধর সর্প থাকিত। সাপটি কখনও কখনও শিশুদের সহিত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, কখনও কোন অনিষ্ট করে নাই। কিন্তু প্রতিবেশীরা ভীত হইয়া ১৩০২ বঙ্গাব্দের অম্বুবাচীর সময় সাপটিকে মারিয়া ফেলে। এই ঘটনার পর বাড়ীতে ছোট বড় নানাপ্রকার অসংখ্য সাপ দেখাযাইতে আরম্ভকরিল। ইহাতে দীনমণি ভীত হইয়া প্রার্থনা করিলে স্বপ্নাদেশ পাইলেন যে, সর্ব্বদা গল-বস্ত্র থাকিয়া "দোহাই চন্দ্র" নামে চন্দ্রদেবের পূজা আরাধনা

কর এবং প্রত্যহ পাঁচপোয়া দুগ্ধ সবরীকলা সহ পাথরের বাটিতে তুলসী তলায় নাগের উদ্দেশ্যে ভোগ দাও। এইরূপে তিনবৎসর পূজা ও আরাধনা করার পর সাপটির পুনর্জীবন লাভের আদেশ পাইলেন। সাপের উপদ্রবও কমিয়া গেল।

তামার টাটে প্রণব লিখিয়া পূজা করা অবধি "বাবা" শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহাকে দর্শন ও আদেশ দিয়া কঠোর সাধনা ও জপ ধ্যানাদি অভ্যাস করাইতে লাগিলেন। তিনিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ব্যতীত কিছুই করিতেন না। এইরূপে উপাসনা ও ধ্যানাদি করিতে করিতে তিনি একদিন, দুইদিন এমন কি একাদিক্রমে পাঁচ ছয়দিন পর্য্যন্ত তন্ময় (সমাধিস্থ) অবস্থায় থাকিতেন। এই কয়দিন সেবা পূজার কাজ বন্ধ থাকিত। মাসে তিন চার বার করিয়া এইরূপ অবস্থা হইত।

শ্রীমৎগোপাল গোস্বামী মহোদয় দেহরক্ষার পূর্ব্বে তাঁহার নিজের শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম বিগ্রহ ব্রহ্মচারীবাবাকে দানকরিয়া যান। ব্রহ্মচারীবাবা বসত বাড়ী হইতে অতি সামান্য দূরে "বাবার" আদেশক্রমে একটি নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়া এই নূতন বাড়ীতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম বিগ্রহ আনয়ন করেন এবং এখানেই শ্রীশ্রীজগন্মাতার আবির্ভাব হয়। নূতন বাড়ীতে বিগ্রহ আনয়ন করিয়া তিনি আদেশ ক্রমে স্বয়ং স্বহস্তে সেবা পূজাদি করিতে লাগিলেন। এই লক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম বিগ্রহ হইতে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত

হইয়া উহাতেই অন্তর্দ্ধান হইতেন। এই সময় হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীবাবার সেবা পূজা ও ভোগাদিতে কোন প্রকার অপরাধ প্রদর্শন করিয়া বলিতেন—"আমি চলিয়া যাইব"। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ব্রহ্মচারীবাবাও সেবা পূজা ও ভোগ বন্ধ রাখিয়া পুনরায় আবির্ভাবের জন্য প্রাণপণে প্রার্থনাদি করিতেন। পুনরায় আবির্ভাবের আদেশ পাইলে, তাঁহারই আদেশক্রমে সেবা পূজাদি সমাধা হইত। প্রায় বার তের বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে চার পাঁচ বার করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় আবির্ভূত হইতেন।

এইভাবে একদিন ব্রহ্মচারীবাবা রাত্রিতে লক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন, এমন সময় পিছনের দিক হইতে একটি তীব্র আলো আসিতে লাগিল। এই আলোর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি দেখিলেন যে, সহস্র ফণা বিস্তারী গগনস্পর্শী এক বিরাট নাগ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে তিনি ভীত হইলেন না, তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। ক্রমে নাগটি ছোট আকার ধারণ করিয়া নিকটবর্ত্তী হইল এবং লক্ষ্মীজনার্দ্দন শাল-গ্রামের গহ্বরে ঢুকিয়া ক্ষুদ্র ফণা বিস্তার করিয়া রহিল। ব্রহ্মচারীবাবা নাগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' নাগ বলিল, "আমি অনন্তদেব"। তারপর ক্রমে নানা দেব দেবী আসিতে লাগিলেন এবং নিজ নিজ পরিচয় দিয়া লক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম বিগ্রহে মিলাইয়া যাইতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমরা কোথায়" ? দেব দেবীরা লক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম হইতে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "এই আমরা, "এই আমরা"। এই সময় হইতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্মীজনার্দ্দনরূপী শ্রীকৃষ্ণ হইতে সাক্ষাৎভাবে আদেশ পাইতে থাকেন।

ব্রহ্মচারীবাবা জানিতেন যে, "ঈশ্বর লাভই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার কোন আবশ্যকতা বোধ করিলেন না। তাঁহার বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বদাই উত্তরসাধিকার মত তাঁহার সাহায্য করিতেন, সুতরাং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ন্যায় কঠোর উপাসনায় অভ্যস্থা হইয়া উঠিলেন।

হোসেনপুর বাজারে তাঁহার মনোহারী জিনিষের এক দোকান ছিল। দোকানের কাজ তাঁহার এক বাল্যবন্ধু মহিম পাল মহাশয় করিতেন, তিনি সেবা পূজাদি সমাপ্ত করিয়া প্রত্যহ একবার দোকানে যাইতেন। এই দোকান তিনি শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজার জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে "বাবা" শ্রীকৃষ্ণরূপে আদেশ করিলেন— "আমার দোকান বন্ধ থাকিবে, তুই মন দিয়া উপাসনা কর।" তদবধি দোকানের কাজ বন্ধ হইল, দোকানের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

তখন সেবা পূজার কার্য্যে এত মনোযোগী হইলেন যে, কোন কাজ করিয়া তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের সময় ছিল না। সেবা পূজাদির জন্য প্রথমতঃ যে কিছু জমি ছিল, আদেশ ক্রমে তাহা সমস্ত ক্রমশঃ বিক্রী হইয়া গেল। পরে থালা,

ঘটি, বাটি ইত্যাদিও বিক্রয় করা হইল। নূতন বাড়ীর ঘর দরজা মেরামত করার আদেশ না থাকায় ব্রহ্মচারীবাবা ঘর দরজার দিকে মনোযোগ দিলেন না। ক্রমে ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। এই সময় তাঁহার গর্ভ-ধারিণী আর সহ্য করিতে না পারিয়া সংসারে বীত-স্পৃহ হইয়া, কঠোরতপা পুত্রকে ফেলিয়া দৌহিত্রীর * বাড়ীতে চিরতরে চলিয়া গেলেন। তখন ব্রহ্মচারীবাবা আদেশ পাইয়াছিলেন, "ও (গর্ভধারিণী) তোর ছটাকে মা, আমিই আসল মা।" তখনও জগন্মাতার আবির্ভাব হয় নাই। সাধনার শেষ অবস্থায় জগন্মাতার আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে আনিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন— "এই তোর মা, এখন আমি যাই।" যথাস্থানে তাহা লিখিত হইবে।

আদেশক্রমে সমস্ত তৈজসপত্র বিক্রয় করা হইল। রান্নার এবং পূজার বাসনপত্রও সমস্তই বিক্রয় করা হইল। এমন কি চূণের হাঁড়িটাও দুই পয়সায় বিক্রয় হইয়াছিল। এই সমস্ত বিক্রয়ের মূল্য পর্য্যন্ত আদেশ ক্রমে ধার্য্য হইত। অতঃপর ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের অমাবস্যা রাত্রি হইতে অন্নভোগ না দিয়া যথালব্ধ ফলমূলাদি দ্বারা সেবার কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বেই আদেশক্রমে বাড়ীতে অনেক ফলমূলের গাছ লাগান হইয়াছিল। দীপাধারটিও আদেশক্রমে বিক্রী হইয়াছিল। আলো কেমন করিয়া জ্বলিবে জিজ্ঞাসা

---

* কুসুম—বাট্টা, কালডোয়ার—পূর্ব্বধলা।

করায়, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার গোলকের আলোতেই কাজ চলিবে।" ব্রহ্মচারী বাবা বলিয়াছেন, বাস্তবিকই কোন আলো ব্যতীতই রাত্রিতে সমস্ত দেখা যাইত, সমস্ত কাজ চলিত। এইরূপে ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আবার অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোগ প্রদানের আদেশ হইল। ফলমূল ভোগ দেওয়ার সময় ব্রহ্মচারী বাবার ভাগিনেয়ী পুত্র সাড়ে চারি বৎসর বয়স্ক শিশু সুধীর কাহারো কোন কথা না শুনিয়া তাহাদের বাড়ী হইতে ব্রহ্মচারী বাবার কাঁধে চড়িয়া জগদল উপস্থিত হইল, এবং ফলমূল প্রসাদ পাইয়া ছয় মাস কাটাইয়া দিল, একদিনও অন্ন প্রসাদের জন্য আবদার করে নাই। পাড়ার কোন কোন লোক ভাবিত, হয়ত তাহারা রাত্রিতে অন্নপাক করিয়া খায়। কিন্তু একদিন এক ঘটনা হইল; ব্রহ্মচারীবাবার পাশের বাড়ীর স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র নাগ মহাশয়ের স্ত্রী প্রভৃতি সকলে ভাবিলেন যে, এই শিশুটি না খাইয়া মরিয়া যাইবে। তাই একদিন আদর করিয়া সুধীরকে কোলে তুলিয়া উক্ত নাগ মহাশয়ের স্ত্রী তাহাদের বাড়ীতে ভাত খাওয়াইবার জন্য নিয়া আসিলেন। কিন্তু যখন সে বুঝিল তাহাকে ভাত খাওয়াইবার জন্য আনা হইয়াছে, তখন সে চীৎকার করিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিল—"দোহাই ঠাকুর! দোহাই ঠাকুর! আমায় ভাত খাওয়াইয়া ফেলিল!" ব্রহ্মচারী বাবা সুধীরের চীৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া উমেশ নাগ

সুধীর ও অধীর ছোটকালে ব্রহ্মচারী বাবাকে "দোহাই ঠাকুর" ডাকিত।

মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন এবং সুধীরকে নিয়া আসিলেন। বালকের এইপ্রকার নিষ্ঠা দেখিয়া নাগ-বাড়ীর এবং গ্রামের সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল এবং তখন গ্রামবাসী সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, তাঁহারা সত্যই ভগবৎ আদেশে অন্নভোগ দেওয়া ছাড়িয়াছেন। যথালব্ধ ফলমূল ও দুধ দ্বারাই ঠাকুরের ভোগরাগ হইত এবং সেই যৎসামান্য প্রসাদ পাইয়াই তাঁহারা ভগবদানন্দে দিন কাটাইতেন।

ছয়মাস ফলমূলাদি ভোগের পর অন্নভোগের আদেশ হইলে, এই সময় হইতে ভিক্ষাদি দ্বারা সেবার কাজ করিতে হইত। তাঁহার সাধন-জীবনে জগদল গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র নাগ, স্বর্গীয় গঙ্গাদাস সরকার এবং স্বর্গীয় শ্রীনাথ রায় দেবশর্ম্মা মহাশয় ও গ্রামের অন্যান্য সকলে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গাঙ্গাটিয়া গ্রামের উদার হৃদয় জমিদার মহোদয়গণ তাঁহাকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ রাত্রিতে প্রার্থনা করিতেন—"বাবা, কাল সেবার কি হইবে?" কোন দিন আদেশ হইত—"কাল সেবার আসিবে।" সেদিন ভোগের জন্য কেহ কিছু দিয়া যাইতেন। কোনদিন আদেশ হইত, "কাল তুই মিলাইবে।" সেদিন ব্রহ্মচারী বাবা ভিক্ষা করিতেন। এই অবস্থায় কোন্ দিন কি পরিমাণ অন্ন ও কি কি ব্যঞ্জন ভোগ লাগিবে তাহারও নির্দ্দেশ পাইতেন এবং সেই অনুসারে দ্রব্যাদি ভিক্ষায় মিলিত। কোন দিন পাঁচ সের চাউল, পাঁচ প্রকার ব্যঞ্জন, কোনদিন বা দশ সের চাউল, চৌদ্দ প্রকার ব্যঞ্জন, কোনদিন বা ধান ভিক্ষা করিয়া পাঁচ সের

চিড়া সন্থ তৈয়ারী করিয়া ভোগ দেওয়ার আদেশ হইত, এবং ব্রহ্মচারীবাবা সেই অনুসারে কাজ করিতেন।

এই সময়ে কোন তৈজসপত্র না থাকাতে, মাটিতে গর্ত্ত করিয়া কলারপাতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া ভোগ নিবেদন করিতেন। ভোগ নিবেদন করিয়া ভোগের ঘর আদেশক্রমে বুকে হামাগুড়ি দিয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে হইত। তদবস্থায় গ্রামবাসী কেহ কেহ দেখিয়াছেন, যেন ব্রহ্মচারী বাবার শরীরে হাড় নাই—একটি মাংসপিণ্ড গড়াগড়ি দিতেছেন। কোন কোন দিন বা শিশু সুধীর তাঁহার পীঠে চড়িয়া বসিত, তাহাকে নামাইয়া দেওয়ার আদেশ ছিল না। সুধীরকে পিঠে করিয়াই ভোগের ঘর প্রদক্ষিণ করিতেন। "ভোগ নিবেদন কালে গুরুস্তুতি (শ্রীশ্রীগুরু-গীতা) পাঠ না করিলে ভোগ গ্রহণ করিব না, গুরুস্তুতি আমার অমিয় পাঠ" 'বাবা' ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। ভোগ গ্রহণের আদেশ পাইলে, তাঁহারা প্রসাদ পাইতেন ও গ্রামবাসিগণকে দিতেন। গ্রামবাসীরা অনেকে প্রসাদের জন্য আগ্রহের সহিত গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আশে পাশে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিত। ভোগ গ্রহণের আদেশ পাইলেও প্রসাদ গ্রহণ ও বিতরণের আদেশ না পাইলে প্রসাদ গ্রহণ ও বিতরণ করিতেন না। এই অবস্থায় তিনি নিজের অপরাধ মনে করিয়া প্রার্থনা করিলে, কোন কোন সময় দুই একদিন পরেও প্রসাদ গ্রহণ করিবার কিম্বা জলে ফেলিয়া দিবার আদেশ হইত। অনেক সময় প্রসাদ বিতরণের আদেশ হইতনা, অথচ প্রচুর প্রসাদ থাকিত,

কয়েকদিন থাকার ফলে প্রসাদে ফুল হইত এবং তাহাই তিনি পাইতেন,—ফেলিয়া দিবার আদেশ হইতনা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশক্রমে একদা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পদ্ম ফুল অর্পণ করিয়া, গ্রহণ করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইলেন—"কত রাজা মহারাজ আমাকে এই রকম ফুল দেয়।" তখন তাঁহার কৃপার অভাব বুঝিয়া সারারাত্রি ও পরদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত আবদার ও আর্ত্তনাদ করিয়াও কোন সাড়া না পাওয়ায় জীবন নিষ্প্রয়োজন মনে করতঃ উন্মাদের ন্যায় নির্ম্মম ভাবে কণ্ঠদেশে দা'র আঘাত করিতে চাহিলে, কে যেন হঠাৎ দা কাড়িয়া নিয়া বলিলেন—"এত অনুরাগ দিলে কেন করিলে ?"

"বাবা" শ্রীকৃষ্ণ একদিন বলিলেন,—"আমি ত প্রসন্নই হইয়াছি, তোর মা না আসিলে হইবে না। আগামী চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে তোর মাকে আনিব, তুই খুব প্রার্থনা করিতে থাক্।"

মাকে ডাকিতে ডাকিতে এই সময়ে একদিন মা দশভূজা-রূপে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—"পূজার মন্ত্র বলিতেছি শুন।" তখন তিনি অঙ্গুলি দ্বারা মাটিতে মন্ত্রগুলি লিখিয়া প্রভাতে কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া তদনুসারে পূজাদি করিতে লাগিলেন। মায়ের আদেশবাক্য বলিয়া শাস্ত্রের সহিত এই সব মন্ত্র মিলাইবার প্রয়োজন হইল না।

তদবধি বাবার আদেশক্রমে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ, শ্রীশ্রীমা মনসাদেবী, শ্রীশ্রীমাসরস্বতী, শ্রীশ্রীকার্ত্তিক, শ্রীশ্রীমাকুলেশ্বরী দেবী, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীবনদুর্গা, শ্রীশ্রীশনি, শ্রীশ্রীমা

মঙ্গলচণ্ডী, শ্রীশ্রীমাষষ্ঠী, শ্রীশ্রীকর্ম্মপুরুষ, (করমাদি), শ্রীশ্রীমাশুভচণ্ডী, শ্রীশ্রীমারক্ষাকালী ও শ্রীশ্রীমাদুর্গা এবং এইরূপ শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ও এতদঞ্চলে মাতৃসমাজে প্রচলিত অনেক দেবদেবীর আবির্ভাবের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে উপাসনাদি করিতে হইয়াছে।

তাঁহার এইরূপ কঠোর সাধনার সময় আশে পাশে নানা প্রকার শক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। ব্রহ্মচারী বাবাকে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য কত বিভূতি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অন্য কিছুতেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সচ্চিদানন্দ লাভ—ইহা হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই; কোন প্রলোভনেই তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। এই শক্তি সমূহ অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় প্রকারেরই ছিল—এমন কি সাক্ষাৎ মায়ের রূপ ধরিয়াও এই শক্তি সমূহ তাঁহার কাছে আসিত। ব্রহ্মচারী বাবা নিজেই আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, মায়ের অশেষ কৃপায় তিনি অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তিগুলিকে এবং সাক্ষাৎ জগন্মতাকে বুঝিতে পারিতেন। প্রতিকূল শক্তির কোন প্রলোভনে তিনি আকৃষ্ট হইতেন না। তখন মায়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের জন্য শুধু মা মা বলিয়া ডাকিতেন। মা আবির্ভূতা হইয়া এই প্রতিকূল শক্তিগুলিকে দূরে তাড়াইয়া দিতেন।

এইভাবে কঠোর তপস্যা ও নানারূপ ভীষণ পরীক্ষার পর স্বয়ং আদ্যাশক্তি কৃপাপূর্ব্বক ১৩১৩ বঙ্গাব্দের শুভ শিব-চতুর্দ্দশী তিথিতে—সিংহবাহিনী, আকাশবরণী, ত্রিনয়নী,

দ্বিভূজা, বাম হস্তে কাটারী, দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা, দক্ষিণ পাদ নিম্নদিকে লম্বিত, অর্দ্ধপদ্মাসীনা, হস্ত পদতল রক্তবর্ণ এবং মুখে মৃদু মৃদু হাসি, মাথায় শুভ্রকিরীট, এই মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন।

এই দর্শনের বর্ণনায় ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন, প্রথমতঃ তিনি দেখিলেন—শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দন শালগ্রাম বিগ্রহের আসনটিতে একটি সিংহশাবক, তাহার উপর মাকে উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী আসীন দেখিতে পাইলেন।

মা কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিলেও অপ্রসন্নভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রহ্মচারীবাবা নিরাশ হইয়া একবার একদিকে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, একদিন শ্রীশ্রীমহাদেব আবির্ভূত হইয়া তিনবার বলিলেন—"তুমি এখানে বসে থাক, তোমার কালী সিদ্ধি হবে।" ইহাতে তিনি আশ্বস্ত হইয়া নবোৎসাহে মা'র প্রসন্নতা লাভের জন্য যত্নবান হন, এবং সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করতঃ রক্তসিক্ত পুষ্প মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। এই সময়ে একদিন বাবা মহাদেব বলিলেন—"ভারতের ইহা (রক্তদান) ভুল।" মা ও সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—"তোকে চতুর্ব্বর্গের ফল দিলাম।" ইহার পরেও তাঁহার শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আরও অনেক দেবদেবী ও মহাপুরুষের দর্শন ও আদেশ লাভ হইতে লাগিল।

ব্রহ্মচারীবাবা একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, আমি সচ্চিদানন্দ লাভ করিতে চাই, দেবতাদি দর্শনে প্রয়োজন কি?" মা বলিলেন—"আমি যাঁর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হই তিনিই সচ্চিদানন্দ।"

তারপর মায়ের আদেশে ১৩১৫ সনের পৌষ মাসের অমাবস্যা রাত্রিতে বোয়াল মাছের ভোগ, এবং মাঘ মাসের অমাবস্যা রাত্রিতে ছাগ বলি দিয়া পূজা ও ভোগ প্রদান করিলেন। বাবা জীব হত্যার প্রবল বিরোধী ছিলেন। মায়ের ইচ্ছাতেই বলি সম্পন্ন হইল এবং উক্তরূপ আমিষ ভোগ প্রদত্ত হইল।

১৩১৬ সনের ৩রা আষাঢ় তিনি মা'র আদেশক্রমে কিশোরগঞ্জে যাইয়া তদানীন্তন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অবগত করাইলেন যে, মা আদেশ করিয়াছেন, "আগামী মঙ্গলবার পূর্ণিমায় অধীরকে বলি লইব।" অধীর সুধীরের ছোট ভাই। উক্ত সংবাদে তাঁহাকে কিশোরগঞ্জে কারারুদ্ধ করা হয়। পরে মাতাপিতাসহ অধীরকে জগদল হইতে আনাইয়া তৎপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ব্রহ্মচারী বাবা সাতদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। "বাড়ীতে মা ও বাবা উপবাসী আছেন, তাঁহাদিগকে না খাওয়াইয়া আমি আহার করিতে পারি না," এই বলিয়া সেই সাতদিন তিনি জলবিন্দুও গ্রহণ করিলেন না। কারাবাসের সময় এস. ডি. ও. মহোদয় কোর্ট-ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ ব্রহ্মচারীবাবাকে দেখিতে যাইতেন। কোর্ট-ইন্সপেক্টর সদাচারী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এই 'বলি'র সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীবাবার সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে,—'মা অধীরকে বলি লইবেন অর্থে, মা তাহাকে গ্রহণ করিবেন,' ইহাই বলির গূঢ়ার্থ ; এবং তখন তিনি অবাঙালী এস. ডি. ও.-কে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে এস. ডি. ও. ঘটনাটি উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং ব্রহ্মচারীবাবা

এতদিন অনাহারে আছেন বলিয়া মুক্তি দিয়া দিলেন।

কারামুক্তির কয়েকদিন পর মা'র আদেশে অধীরের পিতা মাতা অধীরকে কোলে লইয়া ছয়মাসের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইলেন। এই সময়ে ৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার অমাবস্যায় দশমাস বয়সে মা'র প্রসাদ গ্রহণে অধীরের অন্নপ্রাশনের কাজ সম্পন্ন হয়। ইহাতে মা বলিলেন—"আমার প্রসাদ গ্রহণেই বলি হইল।"

ব্রহ্মচারী বাবা 'মা' ও 'বাবার' নিকট এরূপভাবে আত্ম-সমর্পণ করিলেন যে, তাঁহাদের আদেশ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। আদেশানুক্রমে ভিক্ষা করিতেন, আদেশ হইলে ভোগের জন্য অন্নাদি পাক করিতেন, নতুবা পাকই হইত না। ভোগাদি নিবেদন করিয়া গ্রহণের আদেশের অপেক্ষায় থাকিতেন। গৃহীত হওয়ার আদেশ না হইলে অন্নাদি ফেলিয়া দিতেন। আর গৃহীত হওয়ার আদেশ পাইয়াও প্রসাদ গ্রহণের আদেশ পাইলে তবে প্রসাদ পাইতেন।

ক্রমে নূতন বাড়ীর ঘর সব নষ্ট হইয়া গেলে একটা ধারার চালা বাঁধিয়া তথায় "আসন" প্রতিষ্ঠা করিলেন, আর সেই সঙ্গে আর একটি ধারা দিয়া চালা বাঁধিয়া ভোগ পাকের ঘর করিয়াছিলেন। শীত বা ঝড় বৃষ্টিতে কোন বৃক্ষতলে বা কাহারও গৃহতলে আশ্রয় নেওয়ার আদেশ ছিল না। জ্যেষ্ঠা ভগিনীসহ এবং পরে ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর সন্তান সন্ততি-সহ বার তের বৎসরের অধিককাল সময়ই খোলা জায়গায়, অর্থাৎ মুক্ত আকাশতলে অতিবাহিত করিয়াছেন। কঠোর

সাধক হিমালয়ের পর্ব্বত গুহায় আসনাদি সিদ্ধির পর প্রাপ্ত বয়সে একাকী যে ভাবে তিতিক্ষার পরিচয় প্রদান করেন, ব্রহ্মচারীবাবা গ্রামে, সমাজের দশজনের চক্ষুর সম্মুখে পরিবার-বর্গসহ সেইরূপ তিতিক্ষারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমান অধীর সহ তাহার পিতা মাতা কিশোরগঞ্জ উপ-বিভাগের নানা গ্রামে ভ্রমণ করিতেন এবং ব্রহ্মচারী বাবার অনুষ্ঠিত পূজার্চ্চনা, ভিক্ষা, ভোগ নিবেদন, হত্যা, গুরুস্তুতি পাঠ ইত্যাদি অতি নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতেন। ভগবৎ উপাসনার এইরূপ অভিনব প্রণালী দেখিয়া গ্রামবাসীরা অনেকেই তাঁহাদিগকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন ; কিন্তু এক স্থানে বেশীদিন অবস্থান করিবার আদেশ না থাকায় তাঁহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেন, এবং এইরূপে তাঁহারা লক্ষীয়া গ্রামে উপস্থিত হন। তথাকার প্রসিদ্ধ কায়স্থ তালুকদার, কিশোরগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত গুরুচরণ দাস মহাশয়ের ভগিনী শ্রীযুক্তা অমৃতময়ী তাঁহাদের সেবা পূজায় আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ৺পাগলনাথ দেবালয়ে তাঁহাদিগকে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলে, তাঁহারা ঐস্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথারীতি সেবা পূজা ও উপাসনাদি করিতে লাগিলেন। বালবিধবা পরম নিষ্ঠাবতী সাধিকা অমৃতময়ী অবসর সময় তাঁহাদের পাগলনাথ দেবালয়ে আসিয়া গোবিন্দ ব্রহ্মচারীর সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনায় শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীবাবার কঠোর তপস্যা ও সাধনার কথা শুনিয়া ক্রমেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে

এই দেবালয়ে আনিবার জন্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারীকে অনুরোধ করিয়া কৈলাসকে সঙ্গে দিয়া জগদল পাঠান। গোবিন্দ ব্রহ্মচারী জগদলে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী বাবাকে গুরুচরণ বাবুর ও অমৃতময়ীর অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ব্রহ্মচারী বাবা চিরদিনই মায়ের আদেশের প্রত্যাশায় থাকিতেন— এবারও তাহাই হইল। পরে মা'র আদেশক্রমে লক্ষীয়া যাইতে সম্মত হইলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি চলিয়া গেলে তোমার সেবা পূজার কি হইবে?" মায়ের আদেশ ক্রমে মা'র প্রতীক প্রণব অঙ্কিত তামার টাটখানি সঙ্গে করিয়া ১৩১৬ সনের শেষভাগে চিরতরে জন্মভূমি ও সাধনভূমি এবং সিদ্ধপীঠ ত্যাগ করিয়া সমাজের সম্মুখে এই সর্ব্বপ্রথম বাহির হইলেন। ব্রহ্মচারীবাবা গোবিন্দ ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া পাগলনাথ দেবালয়ে উপনীত হইলে, দেবালয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মহাদেব আদেশ করিলেন, "তুই এখানে থাক্।" ব্রহ্মচারীবাবা এখানেই বাস করিতে লাগিলেন, এবং এখান হইতেই মায়ের আদেশে সর্ব্বপ্রথম দীক্ষা প্রদানে শিষ্যাদি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে এই পাগলনাথ দেবালয়ই 'সিদ্ধাশ্রম' নামে অভিহিত হইয়াছিল।

১৩১৬ সনে কিশোরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলবাড়ী নিবাসী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশীয় তালুকদার শ্রীযুক্তযোগেন্দ্রনারায়ণ কারকুন মহাশয় তাঁহার জয়কালী যাত্রারদল সহ লক্ষীয়া গ্রামে উপস্থিত হন। যাত্রার দল লক্ষীয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত

মহেশচন্দ্র দাসের বাড়ীতে অবস্থান করিত। ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ধর সপরিবারে ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং ব্রহ্মচারী বাবাকে বহু শিষ্য ও ভক্তসহ তাঁহার নিজ বাড়ীতে রাখিয়া কিছুদিন সেবা করেন। ঐ সময় কারকুন মহাশয়ের যাত্রাদলের বহুলোক ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দলের উত্তম গায়ক ও অভিনেতা সুরেন্দ্র নামে একটি ১৪।১৫ বৎরের বালক ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গেই থাকিয়া গেল। এই বালক খুব বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিল। ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে থাকিয়া নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া অতি সহজেই বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রের মতবাদের সারমর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল, এবং ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত শিক্ষা লাভ ও ধ্যান ধারণা করিয়া বিচারশীল তপস্বী হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মচারীবাবা পরে এই বালককে সর্ব্বপ্রথম সন্ন্যাস সংস্কার প্রদান করিয়া "শান্তিদানন্দ" নামে অভিহিত করেন। শান্তিদানন্দ "সত্য-গাথা" নামে একটি ছোট কবিতা পুস্তকে ব্রহ্মচারীবাবার উপলব্ধ ও উপদিষ্ট সত্যগুলিকে অতি সহজ ও সরল ভাষায় সহজ ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাত্রার দলের প্রধান গায়ক রাধানাথ সরকার ও এইখানেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে লক্ষীয়া গ্রামের সূর্য্য-কান্ত দাস, শঙ্কর দেব (কন্দল) প্রভৃতি অনেক ভক্ত সস্ত্রীক ও সপরবিারে ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তর তাঁহার অনুষ্ঠিত পথে সাধনা ও উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনেকেই

সস্ত্রীক দীক্ষা নেওয়াতে মহিলা মহলেও সাধনার বেশ সাড়া পড়িল। যাত্রার দলের অধিকাংশ লোকই দীক্ষা গ্রহণান্তর সাধনা করিতে লাগিলেন। লক্ষীয়া এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামে একটা নুতন জীবন ও নূতন চেতনার সঞ্চার হইল, এবং ক্রমেই তাহা বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করিল। ভগবৎ উপসনায় ও সেবাপূজায় এমন নিষ্ঠা—জাতিবর্ণ স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলে ভগবানের উপাসনায়, সেবাপূজায়, জপ ও প্রার্থনায় সমান অধিকারী,—ইহা যেন এক অভিনব ব্যাপার। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত, গ্রাম্য লোকেরা সকল দল ও সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী বাবার উদার ধর্ম্ম মতে (যত নাম ও রূপ এক ভগবানেরই) উপাসনা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ব্রহ্মচারী বাবাকে লইয়া এক নব জাগরণের সাড়া পড়িল। লক্ষীয়া গ্রামের লোকমুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্মচারী বাবার তখনকার শরীরের বর্ণ ছিল পাকা সব্‌রীকলার মত লক্ষীয়া গ্রামে যখন তিনি উপস্থিত হন, তখন পরিধানে কৌপীন, সামান্য একখণ্ড বর্হিবাস এবং সোনার মত উজ্জ্বল কান্তিপূর্ণ শরীরটি একটি জীর্ণ কন্থায় আবৃত। তাঁহাকে দর্শন করিলেই পরম শ্রদ্ধায় সকলের মস্তক অবনত হইত, এবং তাঁহার সুমিষ্ট কথা শুনিতে ও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিত। ব্রহ্মচারীবাবা ছিলেন সাক্ষাৎ করুণার স্নিগ্ধ প্রশান্ত মূর্ত্ত বিগ্রহ।

কিছুকাল লক্ষীয়া গ্রামে বাস করিবার পরই বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণ তাঁহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে ব্রহ্মচারীবাবাকে

লইয়া যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং এইভাবে মায়ের আদেশে শিষ্য ও ভক্ত সাধক সাধিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি মায়ের ইচ্ছা জানিয়া ও বুঝিয়া মায়ের কোলের শিশু ও যন্ত্র হইয়া একেবারে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানব সমাজের মধ্যে একটু ভাগবৎ চেতনা ও ভাগবৎ জীবন জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে তাঁহার মহান তপস্যাপূত তনু মন প্রাণ তিলে তিলে বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

১৩১৭ সনে ব্রহ্মচারীবাবা কিশোরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী নগুয়া গ্রামে স্বর্গীয় সনাতন সাধুজীর বাড়ীতে উপস্থিত হন। তখন সনাতনদা এবং আরও কয়েকজন তথায় কর্ত্তাভজা বা কিশোরী ভজনের এক ব্যভিচারী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিতেন। তাহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করিয়া প্রায় দুইমাস কাল সেখানে অবস্থান করতঃ সনাতনদার বাড়ীতে শ্রীশ্রীরক্ষাকালী মায়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে কঠোর সাধনায় ব্রতী করেন এবং সেই সম্প্রদায়ের পুনর্গঠন করেন। মায়ের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর সনাতনদার বাড়ীটি "শান্তি-আশ্রমে" রূপান্তরিত হইয়া যায়। বাবা অনেকবার সনাতনদার এই শান্তি-আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎকালে ব্রহ্মচারী বাবার আগমন উপলক্ষ্যে নগুয়া, কিশোরগঞ্জ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের বহু শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের সমাগমে এই ক্ষুদ্র আশ্রমবাটিকা সতত এক স্বর্গীয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-হিল্লোলে পরিব্যাপ্ত থাকিত।

দিনমানের কর্ম্মকোলাহল ক্লান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত সহরের বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি দিনান্তে একবার সহরের উপকণ্ঠস্থ এই আশ্রমে আসিয়া বাবার পাদস্পর্শ করিয়া এবং তাঁহার নিকট ভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া শান্তিলাভ করিতেন। ঐ সময়ে তদঞ্চলের বহু ভক্ত এইস্থানে দীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। গাঁচহাটা গ্রামের শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়কে ব্রহ্মচারীবাবা ১৩২৪ সনের আষাঢ় মাসে এই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীরক্ষাকালী মায়ের সম্মুখে বসিয়া কৃপা পূর্ব্বক দীক্ষিত করেন। তাহার মনে সদ্‌গুরু লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীউর শিষ্য আবাল্য সাধক নিদান-সাধুজী তাহাকে বলেন—"শ্রীমৎভারত ব্রহ্মচারী একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ, তিনি সদ্‌গুরু। তুমি তাঁহার নিকট যাও।" গচিহাটার শ্রীইন্দু ভূষণ দত্তরায়ও অরুণাচলের দয়ানন্দস্বামীজীর শিষ্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত এইস্থানেই সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মচারী বাবার দর্শনলাভ করেন, পরে লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রমে তাহার দীক্ষালাভ হয়।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের প্রথমভাগে ব্রহ্মচারী বাবা জঙ্গলবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ কারকুন মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া তথায় শ্রীশ্রীজয়কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি কারকুন মহাশয় যাত্রারদল ছাড়িয়াদিয়া উপসনা ও মায়ের সেবা পূজাদিতে মনোনিবেশ করিলেন। ব্রহ্মচারী বাবার উপদেশ মত কঠোরভাবে সাধনা করিতে করিতে তিনি আদ্যা-শক্তি মহামায়ার দর্শন, আদেশ ও ইঙ্গিত লাভ করিয়াছেন।

১৩১৮ সনের ২৬শে ফাল্গুণ মায়ের আদেশে লক্ষীয়া পাগলনাথ সিদ্ধাশ্রম হইতে ব্রহ্মচারী বাবা নবদ্বীপ যাত্রা করেন। শান্তিদানন্দ, রাধানাথ সরকার ও সূর্য্যকান্ত দাস তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। নবদ্বীপে শ্রীশ্রীমৎ মহাপ্রভুর আবির্ভাব করাইবার জন্য মন্দিরের সম্মুখে তিনি আড়াই দিবস হত্যায় ছিলেন ; তদবস্থায় আদেশ হইল—"আমি যাব" (আবিভূ́ত হইব)।

ব্রহ্মচারীবাবার অন্যতম গুরু শ্রীমৎগোপাল গোস্বামী অপুত্রক ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীবাবাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমার পুত্র নাই, তুমিই আমার পুত্র স্বরূপ। নাদপুত্র ও বিন্দুপুত্র একই। নাদপুত্র অর্থাৎ মন্ত্রশিষ্য এবং বিন্দুপুত্র অর্থাৎ ঔরসজাত পুত্র।" গোপালগোস্বামী ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দেহত্যগের পূর্ব্বে উপরোক্ত দুই প্রকার পুত্রের ব্যাখ্যা করায় তাঁহার দেহত্যাগ হইলে তিনি গয়াতে তাঁহার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিবেন সঙ্কল্প করেন। মায়ের আদেশক্রমে নবদ্বীপ হইতে গয়াধামে উপনীত হইলে মা বলিলেন—"অন্নাদি পাক করিয়া পঞ্চক্রোশের ভিতর ভোগ দিলে পিণ্ডদান সিদ্ধ হইবে। অতএব গয়াতে বার দিন থাকিয়া মায়ের আদেশ মত অন্ন পাক করিয়া ভোগ দিলেন। এই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ পদে দৈবক্রমে চিম্‌টা পড়িয়া যাওয়ায় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া

সূর্য্যকান্ত দাস ব্রহ্মচারীবাবার উপদেশে নবদ্বীপ হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহার মাতা খুব অসুস্থা হইয়া পড়িয়াছেন। তখন বুঝিলেন, ব্রহ্মচারীবাবা কেন তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন।

সঙ্গী ভক্তগণসহ সিদ্ধাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরম ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধর সপরিবারে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধাসহকারে ছয়মাস কাল অবিশ্রান্ত সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করেন।

অতঃপর ১৩১৯ সনের অগ্রহায়ণ মাসে বালক স্নুরেন্দ্রের আগ্রহে তাহার জন্মভূমি নেত্রকোণা উপবিভাগের অন্তর্গত কেন্দুয়া থানার নিকট রৈরাটী গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। ঠিক লক্ষীয়ার ন্যায় বৈরাটী গ্রামেও ব্রহ্মচারীবাবাকে লইয়া খুব সাড়া পড়িল। গ্রামবাসীদের অনেকে সস্ত্রীক দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারী বাবার অনুষ্ঠিত ও উপদিষ্ট পথে উপাসনা করিতে লাগিলেন। যাহারা দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন, তাহারা তাহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে সামর্থ্যানুযায়ী স্বতন্ত্র একখানি ঠাকুরঘর বা আসনঘর তৈয়ারী করিয়া লইলেন। যাহারা অসমর্থ তাহারা নিজদের বাসগৃহেরই এক কোণে বা পার্শ্বে একটি আসন স্থাপন করিয়া তাহাতে পূজার্চ্চনা ও উপাসনা করিতেন। ব্রহ্মচারীবাবা উপাসনার স্থান সম্বন্ধে বলিতেন, উপসনা করিবে—"মনে, বনে, কোণে।" প্রথমতঃ গ্রামের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যেই তাঁহার কাজ আরম্ভ হইল। ব্রহ্মচারীবাবা যেদিন যে বাড়ীতে যাইতেন, আগের দিনই তাহা নির্দ্দিষ্ট হইত, আগামীকল্য কোন্ বাড়ীতে তাঁহার শুভাগমন ও ভোগ লাগিবে। সেদিন সে-গৃহ বিশেষ পূজা বা আনন্দোৎসবে পরিণত হইত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সদাচার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইত। তাঁহার অবস্থান ক্ষেত্রে একটি পবিত্র শান্ত আবহাওয়া আপনা হইতেই সৃষ্ট হইত।

স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই সদ্‌ভাবে ও ধর্ম্মভাবে ভরপুর থাকিত। ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গপ্রিয় শিষ্যগণ, যাহারা আশ্রম-জীবন ও অধ্যাত্ম-জীবন লাভের জন্য সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, তাহাদের মধ্যে যিনি বিশেষ অধিকারী ও নিষ্ঠা-পরায়ণ তিনিই ভোগের পাক করিতেন, এবং ভোগারতি সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মচারীবাবা ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া আনন্দের সহিত প্রসাদ পাইতেন। সে যেন একটি মহোৎসব; কিন্তু কোন আরম্বর নাই, আয়োজনের বাহুল্য নাই। প্রসাদ যাহারা পাইতেন তাহারা সকলেই অনুভব করিতেন, সে প্রসাদ কি সুস্বাদু তৃপ্তিপূর্ণ ও পবিত্র!

এইভাবে বৈরাটী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকে গ্রামে গ্রামে ব্রহ্মচারীবাবার কথা প্রচার হইতে লাগিল—কোন লিখিত পুস্তকদ্বারা নয়, পত্রিকার বিজ্ঞাপন দ্বারা নয়, পরন্তু তাঁহার সুমধুর ব্যবহার, আধ্যাত্মিক প্রভাব, সামাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন প্রণালী দেখিয়া পঞ্চাশ লক্ষাধিক অধিবাসী অধ্যুষিত বাংলার সর্ব্ব বৃহৎ জেলা ময়মনসিংহের পূর্ব্বাঞ্চলের সুদূর পল্লীগ্রামে যেখানে আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক পৌঁছে নাই, এমন কি যেখানে কোন সংবাদপত্রও দুর্ল্লভ—যে সমস্ত গ্রামবাসীর নিকট সাধুসন্ত মহাপুরুষের আগমন কল্পনাতীত ছিল, সেই সকল পল্লীর ঘরে ঘরে স্বয়ং আদ্যাশক্তি জগজ্জননী তাঁহার মূর্খ অশিক্ষিত পতিত সন্তানগণের প্রতি অসীম করুণা পরবশ হইয়াই যেন ব্রহ্মচারীবাবাকে যন্ত্র করিয়া তাঁহার অনন্ত কৃপা-করুণার বিস্তার করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারী

বাবা যখন যে গ্রামে পদার্পণ করিতেন, সেখানেই এক পরম আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইত,—যেন তাহারা এক নব জীবন নব চেতনা ও নূতন আলোকরশ্মির সন্ধান পাইত—যদিও তাহারা জানিতনা সে চেতনা ও জীবন কি? তাহারা শুধু দেখিত ব্রহ্মচারীবাবাকে, তাহাতেই তাহারা নূতন আনন্দে, নবীন প্রেরণায় মাতিয়া উঠিত।

এই বৎসর তিনি বৈরাটী গ্রাম নিবাসী কায়স্থ তালুকদার পত্র-নবীশ মহাশয়গণের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের শ্মশান ভূমিস্থ শ্রীশ্রীহরগৌরী বটবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই স্থানটিই পরবর্ত্তীকালে বৈরাটী গৌরী-আশ্রম নামে অভিহিত হয়। ইহাই ব্রহ্মচারী বাবার প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় আশ্রম। এই সময়ে শ্রীমৎ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী, তাঁহাদের তিনটি ছেলে সুধীর, অধীর ও গোপাল, এবং তিনটি মেয়ে সুমতি, বনবাসী ও নির্ম্মলা এবং ব্রহ্মচারীবাবার জ্যেষ্ঠাভগ্নী উত্তর সাধিকা নিত্যময়ী—উপরোক্ত ছেলেমেয়েদের দিদিমা, উক্ত আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহাদিগকে উক্ত আশ্রমের সেবাপূজার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা আবার লক্ষীয়া পাগলনাথ সিদ্ধাশ্রমে চলিয়া গেলেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দ হইতে দক্ষিণ-ভারতে পর্য্যটনে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উপরোক্ত সিদ্ধাশ্রমে, কিশোরগঞ্জ নগুয়ার সনাতনদার বাড়ীতে, বয়লা গ্রামে, জঙ্গলবাড়ীর শ্রীযুক্তযোগেন্দ্রনারায়ণ কারকুণ মহাশয়ের বাড়ীতে, এবং বৈরাটী আশ্রম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আমতলা, সাজিউরা, কান্দীউরা, আদমপুর প্রভৃতি

গ্রাম সমূহে শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে কখনও কখনও যাইতেন। এইসময়ে বৈরাটী হইতে ৺সরলানন্দ, সুশীলানন্দ, পাতুয়াইর হইতে অবলানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সংসার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীবাবার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচারীবাবা নির্দ্দিষ্টভাবে কোন আশ্রমে অবস্থান করিতেন না। উক্ত-ভক্তগণও ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন।

১৩২০ সনের ফাল্গুণ মাসে ব্রহ্মচারী বাবা বৈরাটী গৌরী-আশ্রম হইতে চন্দ্রনাথ-ধাম অভিমুখে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন একমাত্র শান্তিদানন্দ। চন্দ্রনাথ হইতে মায়ের আদেশে নবদ্বীপ ও কলিকাতা কালীঘাট হইয়া রথযাত্রার সময় তাঁহারা পুরীধামে উপস্থিত হইলেন। তখন মা বলিলেন—"সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইয়া তোর বাবার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে।"

রামেশ্বরে যাইয়া আট দিন প্রার্থনা করিলে—"বাবা" আদেশ করিলেন—"তুই দেশে যা, আমি সর্ব্বদাই তোর কাছে থাকিব, যখন ডাকিবে তখনই পাইবে।" ব্রহ্মচারী বাবা বলিয়াছেন যে, এই দক্ষিণ-ভারতে যাতায়াতের প্রায় সমস্ত পথই পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রায় আট মাস লাগিয়াছিল। ব্রহ্মচারীবাবা শান্তিদানন্দ সহ একমাত্র মা'র উপর নির্ভর করিয়াই কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় এই সুদীর্ঘ পরিভ্রমণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, খুব ভোরে উঠিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিতেন এবং আট কি দশ মাইল হাঁটিয়া রৌদ্র প্রখর হইবার পূর্ব্বেই কোন জলাশয়ের

কাছে কিম্বা কোন বাজার বা বৃক্ষতলে বিশ্রামের এবং ভিক্ষা ও ভোগের উপযোগী স্থান খুঁজিয়া লইয়া, তথায় ভিক্ষা, ভোগ ও সেবাদি সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিতেন। বৈকালে রৌদ্রের উত্তাপ কমিয়া গেলে আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিতেন এবং পাঁচ কি সাত মাইল হাঁটিয়াই রাত্রি যাপনের স্থান খুঁজিয়া লইতেন। এইরূপে প্রতিদিন চৌদ্দ পনর মাইল মাত্র চলিতেন। তিনি বলিতেন, 'দীর্ঘপথ পদব্রজে চলিতে হইলে এইভাবে চলিলে কষ্ট হয় না, এবং পদব্রজে পর্য্যটনেই বেশী অভিজ্ঞতা লাভ হয় ও অনেকস্থান দেখা হয়। একাকী বা একত্রে দুইজন মাত্র ভ্রমণ করা উচিত।' এই পর্য্যটন হইতে ফিরিবার সময় শান্তিদানন্দের খুব পেটের অসুখ হয় এবং তিনি খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। ব্রহ্মচারী বাবা বলিয়াছেন যে, দুইজনের মধ্যে মাত্র একখানি কম্বল ছিল, তাহার অর্দ্ধেক নীচে বিছাইয়া নিজে শুইতেন এবং শান্তিদাকে বুকের উপর রাখিয়া কম্বলের অপরার্দ্ধ উপরে জড়াইয়া লইতেন। দৈবাৎ যদি কোথাও রেল গাড়ীতে উঠিতে হইয়াছে, সঙ্গে পয়সা না থাকায় ষ্টেশন মাষ্টার বা গার্ডকে বলিয়া গাড়ীতে উঠিতেন এবং যথাস্থানে আবার নামিয়া যাইতেন। একদিন কোন গ্রামে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়া কয়েক বাড়ী হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন; সকলেই সেদিন ভিক্ষা দিল—ভাত ও তরকারী। ভিক্ষান্ন ও তরকারী নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইবার সময় দেখিলেন যে, তাহাতে টুক্‌রা টুক্‌রা মাংস (মুরগীর মাংস) রহিয়াছে। ভিক্ষান্ন নিবেদন করিয়া মা'র প্রসাদ পাইলেন,

আর বলিলেন—'গ্রামখানি হয়ত মুসলমানদের হইবে !' একদিন উড়িষ্যা প্রদেশের কোন গ্রামের পথে চলিবার কালে সামান্য কিছু চাউল ও কয়েকটি পয়সা মাত্র ভিক্ষা মিলিয়াছিল। সারাদিন অনাহার, সন্ধ্যাবেলায় একটি মাটির হাঁড়ি খরিদ করিয়া এক দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ীর পাশে অন্নাদি পাক করিয়া ভোগ নিবেদনান্তে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী বাবা বলিয়াছিলেন যে, গ্রামটি এত দরিদ্রের যে রান্নার পোড়া হাঁড়িটি দিবার জন্য অনেকেই তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বাবা শান্তিদাসহ সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট প্রসাদসহ হাঁড়িটি গৃহস্বামীকে দিয়াদিলেন। উপস্থিত সকলকেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ বিতরণ করিয়া হাঁড়িটি গৃহস্থ নিজে রাখিল। পর্য্যটন সমাপ্ত করিয়া ১৩২১ সনের মধ্যভাগে তিনি বৈরাটী গৌরী আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৩২২ সনের মাঘ মাসে ব্রহ্মচারী বাবা সর্ব্বপ্রথম কাঁঠালতলী গ্রামের স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করেন এবং কয়েকদিন তথায় অবস্থান করেন। বনগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্রমহলে তখন খুব সাড়া পড়িয়া যায় এবং অনেক ছাত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। সেই সময়ে ক্ষিতীশদত্ত, পুলিনবিহারী সরকার, উমেশদাস (ধীরানন্দ), অতুল মাষ্টার, মুরারিমোহনদা, রজনী মাষ্টার, শশীমোহনদা প্রভৃতি এবং অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পর ব্রহ্মচারী বাবা বৈরাটী

গৌরী-আশ্রমে ফিরিয়া যান এবং তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর ১৩২৩ সনের প্রথম ভাগে লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রমে গমন করেন। এই সময় এখানে শ্রাবণ মাসে কেদার সরকার (বনগ্রাম), সতীশ দে (মস্থূয়া) সুরেশ পাল (অষ্টবর্গ) প্রভৃতি ভক্তগণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়েও আশ্রমে দৈনন্দিন সেবা পূজার নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল না। প্রায়ই গ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী, পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ধর মহাশয়ের বাড়ীতে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইত। ব্রহ্মচারী বাবা ও তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণ সহ সেখানে প্রসাদ পাইতেন। ঐ বৎসর কৃষ্ণচন্দ্রধর মহাশয়ের বাড়ীতে ৺দুর্গা পূজা সম্পন্ন করিয়া তিনি বৈরাটী গমন করিলেন। সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করতঃ তদঞ্চলের ভক্তগণকে ভগবদুপাসনায় সাহায্য করিলেন। ১৩২৪ সনের মহাবিষুব সংক্রান্তিদিনে বৈরাটীর পরমভক্ত সুশীলানন্দের বাড়ীতে যোগানন্দ (যতীন্দ্র, করগাঁও) ব্রহ্মচারী বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই সময় সুশীলানন্দের বাড়ীতে শান্তিদানন্দ, রাজকিশোরদা (জঙ্গলবাড়ী), ভজনদা (আঠারবাড়ী) প্রভৃতি ভক্ত ও শিষ্যগণ ব্রহ্মচারী বাবার সঙ্গে ছিলেন। ১৩২৫ সনের প্রথম ভাগেই তিনি শিষ্যগণ সহ আবার লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রমে গমন করেন। সংসার ত্যাগী যুবক শিষ্যগণের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শান্তিদানন্দ, সুশীলানন্দ, অবলানন্দ, সরলানন্দ, মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি সংসার ত্যাগী শিষ্যগণ ব্রহ্মচারী বাবার সঙ্গে সিদ্ধাশ্রমে

অবস্থান করিতে লাগিলেন।

লক্ষীয়া পাগলনাথ দেবালয় স্থানটি ব্রহ্মপুত্র নদের খাঁড়ির উপর অবস্থিত, তাহার নীচেই একটি ভীষণ শশ্মান। যদিও চারিদিকেই লোকালয় তথাপি প্রাকৃতিক ভাবেই স্থানটি লোকালয় হইতে স্বতন্ত্র এবং কিছুদূরে জঙ্গলপূর্ণ একটি নির্জ্জন স্থানে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে অবস্থিত। এই অশ্বত্থ বৃক্ষটিই পাগলনাথ শিবরূপে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া থাকেন। প্রাকৃতিক ভাবেই এই স্থানটি গভীর নির্জ্জন ও একান্ত সাধনার স্থান। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীবাবা স্বীয় জন্মভূমি ও সাধনভূমি চিরতরে ত্যাগ করিয়া মায়ের আদেশে এখানেই সর্ব্বপ্রথম আসেন, এবং পাগলনাথরূপী মহাদেবের আদেশ পান—"তুই এখানে থাক্," তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। যদিও ইহা পূর্ব্ব হইতেই আশ্রম বলিয়া অভিহিত হইতেছিল, প্রকৃতপক্ষে ১৩২৫ সন হইতেই ইহা প্রকৃত 'সিদ্ধাশ্রম'—তপোবনে পরিণত হইল। সর্ব্বত্যাগী কঠোরতপা ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার অর্থ, পাকা ঘর-বাড়ী, দালান কোঠা তো নয়ই, এমন কি কোনও কাঁচা ঘর দরজা ও নয়। সামান্য কয়েকটি তপস্যা-কুটীর—বাঁশের খুঁটি, ছনের ছাউনি, দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৭ হাত ও ৫ হাত হইবে। শরীর ও মাথা গুঁজিবার মত ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর মাত্র। আশ্রমবাসী শিষ্যগণ বাবার আদেশক্রমে আশ্রমের ইতস্ততঃ ঝোপ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে নিজেরাই এইরূপ কতকগুলি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কঠোর সাধন ভজনে নিবিষ্ট

হইলেন। আহারের কোনই স্থায়ী ব্যবস্থা নাই, নির্দ্দিষ্ট মাসিক চাঁদা বা কোন আয়ের পথ নাই—ভিক্ষা মাত্র সম্বল। পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ এতদ্দেশে এরূপ আশ্রম ইহাই সর্ব্বপ্রথম। ব্রহ্মচারীবাবা লক্ষীয়া এবং তাহার তুই তিন মাইলের মধ্যবর্ত্তী গ্রাম সমূহে আশ্রমবাসী ভিক্ষুক দ্বারা প্রচার করিলেন যে, আশ্রমের জনৈক ভিক্ষুক প্রত্যহ মাত্র পাঁচ বাড়ী ভিক্ষা করিবে—মুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্ত্তে তাহাকে অন্ততঃ একজন লোকের সেবা হইতে পারে তদনুযায়ী চাউল, ডাল, তরকারী, তৈল, লবণ, হলুদ ইত্যাদি সবই যেন দেওয়া হয়, কারণ আশ্রমের অন্য কোন আয় নাই, ভিক্ষায় যাহা মিলিবে তাহা দ্বারাই আশ্রমের সেবা পূজা চলিবে; এবং এইরূপ ভিক্ষা একজন গৃহস্বামীকে মাসে মাত্র একদিনই দিতে হইবে।" ঋষিতুল্য ব্রহ্মচারীবাবার খুবই প্রভাব ছিল—এবং লক্ষীয়া অঞ্চলের অধিবাসিগণ অধিকাংশই তখন বেশ সচ্ছল অবস্থাপন্ন ছিলেন। আশ্রমবাসী ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইলে তাঁহারা অতি শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যথেষ্ট পরিমাণ ভিক্ষা দিতেন, এবং পাঁচ বাড়ী ভিক্ষা দ্বারা পাঁচ সাত জনের সেবা অনায়াসেই চলিত। লক্ষীয়া, বরাটিয়া, নিশ্চিন্তপুর, আইঙ্গাদি, কুমারপুর, মির্জ্জাপুর, প্রভৃতি গ্রামের বিশেষ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের তুই এক বাড়ী হইতেই যে ভিক্ষা দিতেন, তাহা ভিক্ষার ঝুলিতে কাঁধে করিয়া আনা কষ্টকর হইত; তাহাতে প্রায় ২০।২২ জনে প্রসাদ পাইতে পারিত। এইপ্রকার ভিক্ষা ব্রহ্মচারীবাবাই সর্ব্বপ্রথম ঐ অঞ্চলে প্রচলন করেন, তাহাতেই আশ্রমের সেবা চলিত। উৎসবাদির সময়

কুটীরগুলি ভক্তরা নিজেরাই মেরামত বা সংস্কার করিয়া লইতেন। চারিদিকে জঙ্গল থাকায় জ্বালানীকাঠের অভাব হইত না। তপস্বী যুবক ব্রহ্মচারীদের পক্ষে একটি বাঁশের ধারা, শ্মশান হইতে সংগৃহীত কন্থা, কম্বল এবং পরিধানের জন্য সামান্য কৌপীন বহির্বাসই ছিল যথেষ্ট—জামা, জুতা, খরম, ছাতা, তৈল, সাবানের বালাই ছিলনা। একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ছিল, রাত্রিতে আরতি হওয়া পর্য্যন্ত জ্বলিত। বলা বাহুল্য চব্বিশ ঘণ্টায় একবার মাত্রই প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মধ্যাহ্নের প্রসাদ কোনদিন বাড়িলে জলদিয়া রাখা হইত, তাহাই রাত্রে গ্রহণ করা হইত। রাত্রিতে সেবার ব্যবস্থা ছিলনা—সঞ্চয়ের ও নিয়ম ছিলনা। অতিরিক্ত মুষ্টি ভিক্ষালব্ধ চাউল বিক্রয় করিয়া যুবক ব্রহ্মচারিগণ আবশ্যকীয় শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পড়িতেন ; তাহাতে একটি ছোটখাট লাইব্রেরী হইয়াছিল। আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীদের দৈনন্দিন কার্য্য ছিল, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া সৌচাদি সম্পন্ন করিয়া আসন, প্রাণায়াম ও ধ্যানান্তে স্নানাদি করিয়া কেহ ঠাকুর পূজা করিত, কেহ আশ্রম প্রাঙ্গণ ঝাঁটদিত, কেহ ভিক্ষায় যাইত, কেহ ফুল তুলিত, কেহ বা লাকড়ি সংগ্রহ করিত। ভিক্ষা হইতে আসিলে, কেহ চাউল ডাল বাছিয়া দিত, কেহ ভোগের পাক করিত এবং কেহ বা ভোগের পাকে সাহায্য করিত। ভোগপাক সম্পন্ন হইলে ভোগ নিবেদন করিয়া আশ্রমবাসী এবং উপস্থিত ভক্তগণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গুরুস্তুতি পাঠ করিতেন ও গড়াগড়ি দিতেন। ভোগ নিবেদন হইয়া গেলে

তারপর সকলে এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ পাইতেন। ব্রহ্মচারীবাবাও একত্রই বসিতেন এবং তিনিও একই প্রসাদ পাইতেন। তাঁহার জন্য পৃথক বা বিশেষ কিছু ব্যবস্থা কখনও ছিল না এবং তিনি তাহা একেবারেই পছন্দ করিতেন না। ব্রহ্মচারীবাবা এবং শিষ্য ও ভক্তগণের খাওয়া ও থাকার একই সমান ব্যবস্থা ছিল।

লক্ষীয়া গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপদেশে মুমুরদিয়ার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশীয় ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় কৈশাসচন্দ্র দত্তরায় মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণী তাঁহাদের কুলবিগ্রহ শালগ্রাম এবং একটি বৃহদাকার শিবলিঙ্গ ব্রহ্মচারী-বাবাকে দান করেন। কাঁঠালতলী নিবাসী ব্রহ্মচারীবাবার অন্যতম প্রিয় শিষ্য স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় ঐ বিগ্রহদ্বয় মুমুরদিয়া হইতে লক্ষীয়া পাগলনাথের দেবালয়ে আনয়ন করিলে, ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শিবচতুর্দ্দশী নিশীথে ব্রহ্মচারীবাবা 'শ্রীশ্রীসুদর্শন' নামে শালগ্রাম এবং "শ্রীশ্রীজগদ্গুরু সচ্চিদানন্দশিব" নামে সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বৎসরই রামানন্দ (রমনীমোহন গুহ কবিরাজ, শেখরনগর বিক্রমপুর, ঢাকা) দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই শিবচতুর্দ্দশী উৎসব সমাপনান্তে মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতিকে সিদ্ধাশ্রমের সেবা পূজায় নিযুক্ত করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা বৈরাটী গৌরী আশ্রমে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩২৬ সনের ৮ই আশ্বিন ময়মনসিংহে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা হয় এবং তাহাতে বহুলোকের ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ হয়। ধান্যাদি ফসল বহুলাংশে

নষ্ট হওয়ার ফলে এতদঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। এই সময়ে ব্রহ্মচারীবাবা মায়ের আদেশ পাইলেন, শুভ দীপান্বিতা তিথিতে (১৩২৬ সন) তাঁহার সিদ্ধিপ্রদায়িনী শ্রীশ্রীভারতেশ্বরী মহাদেবীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এবং চারিদিকে শিষ্যগণের মধ্যে এই শুভ-সংবাদ প্রচার করা হইল।

এই সময় পর্য্যন্ত গৌরী-আশ্রমেও বিশেষ কোন ঘরদরজা ছিল না। ব্রহ্মচারীবাবা বলিলেন যে, মা বলিয়াছেন—"রস্তু আসিয়া (একজন শক্তিশালী মুসলমান পয়গম্বর) আশ্রম সংস্কার করিবেন।" কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল কান্দিউরা হাইস্কুলের মহেন্দ্র বিশ্বাস, নগেন্দ্রচন্দ্র ধর, উপেন্দ্রচন্দ্র সরকার প্রভৃতি ছাত্র শিষ্যেরা এবং আশ্রমবাসী ও গ্রামবাসী শিষ্যগণ সমবেতভাবে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মাটিকাটা হইতে আরম্ভ করিয়া, মণ্ডপ, ভোগের ঘর, অস্থায়ী কুটীর প্রভৃতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ম্মাণ করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন যে,—"মহাপুরুষ রস্তুর শক্তি কর্ম্মিগণের উপর কাজ করিয়াছিল, সেইজন্য এত পরিশ্রমের কাজ এত অল্প সময়ের মধ্যে ও সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল।" যথা সময়ে ব্রহ্মচারীবাবা সুন্দাইল নিবাসী স্বর্গীয় কালাচাঁদ আচার্য্য দ্বারা মায়ের মৃন্ময়ীমূর্ত্তি তৈয়ারী করাইলেন। মূর্ত্তির মুখখানি, এবং শরীরের গঠন ইত্যাদি যেমন যেমন সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মাকে দর্শন করিয়াছিলেন, ঠিক সেইমত আচার্য্যকে খুঁটিনাটি সব বলিয়া বলিয়া সঙ্গে থাকিয়া বাবা করাইয়া লইলেন। বাস্তবিক কালাচাঁদ আচার্য্যের নির্ম্মিত মৃন্ময়ী মূর্ত্তির মুখমণ্ডলে কি প্রশান্ত

সৌম্যভাব, মৃদুমৃদু হাসি—কি অপরূপ আনন্দময়ী মাতৃমূর্ত্তি! এক সের আতপ চাউল, এক পয়সার ধূপ ও তৈলের জন্য একটি পয়সা সঙ্গে করিয়া দীপান্বিতা তিথিতে বৈরাটি গৌরী-আশ্রমে উপস্থিত থাকিয়া মায়ের পূজার্চ্চনা ও প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস থাকিবার জন্য শিষ্যগণের প্রত্যেককেই জানাইলেন।

পূজার ও প্রতিষ্ঠার দিন সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী গৌরী-আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যাকালে মায়ের পূজা ও ভোগের যথারীতি আয়োজন হইল। প্রায় দেড় প্রহর রাত্রি অতীত হইলে ব্রহ্মচারীবাবা স্বয়ং পূজায় বসিলেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে উপস্থিত শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী প্রত্যেকে এক একটি ধূপ ও দীপ জ্বালিয়া পূজার ঘরের চতুষ্পার্শ্বের আঙ্গিনায় উপবেশন করিয়া সকলে ধ্যানস্থ হইলেন। এই সময়ে আশ্রমে পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজমান ছিল। এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলে গভীর নিশীথে ব্রহ্মচারীবাবা মায়ের আবির্ভাবের জন্য সুগভীর প্রণব ধ্বনিতে মাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণও তখন ব্রহ্মচারী বাবার ধ্বনির সহিত ধ্বনি মিলাইয়া প্রণবধ্বনি আরম্ভ করিলেন। সেই মহাধ্বনি গভীর রাত্রির নীরবতা ভেদ করিয়া অনন্ত আকাশে বিলীন হইতে লাগিল। কিছু সময় অতিবাহিত হইলে প্রণবধ্বনি থামিয়া গেল, আবার নীরবতা ফিরিয়া আসিল। এমন সময় শান্তিদানন্দ নিজ আসন ত্যাগ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিতে লাগিলেন,—'মায়ের আবির্ভাবের জন্য আমাদের অন্তরের ডাক মায়ের কাছে পৌঁছান

চাই, এবং অন্ততঃ একবিন্দু অশ্রুজলেও মায়ের চরণ সিক্ত করা চাই।' মায়ের আবির্ভাবের আকুল আগ্রহে অমনি সকলে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। গভীর নিশীথে সে মা মা রবের উচ্চ কোলাহলে চতুষ্পার্শ্বের গ্রামবাসিগণ আশ্রমে কোন কিছু ঘটিয়াছে আশঙ্কায় ঐ দিকে ছুটিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। আগন্তুক বহু লোকের ভিড় হওয়াতে সকলকেই নিজ নিজ আসন ছাড়িয়া উঠিতে হইল। ব্রহ্মচারীবাবা তখনও মায়ের প্রতিমার সম্মুখে সমাধিস্থ ছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'মা আসিয়াছেল রে।' তিনি স্বহস্তে উপস্থিত সকলকে চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য প্রদান করিলেন। প্রায় দুই মণ আতপ চাউলের নৈবেদ্য, দুই মণ দুগ্ধ এবং ফলমূল মিষ্ট দ্রব্যাদির ভোগ নিবেদন করা হইয়াছিল। লোক সমাগম এত হইয়া পড়িল যে, প্রত্যেকে সামান্য মাত্র প্রসাদ পাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তৎপর দিন মধ্যাহ্নে আনুমানিক দশ মণ চাউলের অন্নভোগ লাগিয়াছিল এবং প্রায় সহস্রাধিক লোক উদর পূর্ণ করিয়া প্রসাদ পাইয়া ছিলেন। এইভাবে ১৩২৬ সনে প্রথম দীপান্বিতা উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

বৈরাটী গৌরী-আশ্রমে দিপান্বিতা উৎসব সমাপনান্তে ব্রহ্মচারীবাবা কয়েকজন ভক্ত সমভিব্যাহারে বিভিন্ন গ্রামের গৃহস্থ শিষ্যগণের অনুরোধে তাহাদের বাড়ীতে বাড়ীতে ভ্রমণ করিতে করিতে লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রমে শিবচতুর্দ্দশীর কিছুদিন পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে কয়েকজন গৃহস্থভক্ত

তাহাদের আট হইতে বার বৎসর বয়স্ক কুড়ি পঁচিশটি বালককে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমোচিত শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচারীবাবার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। তিনি উক্ত বালকদিগকে পাইয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমোচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সিদ্ধাশ্রমে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। খামার-গাঁওয়ের সত্যেন্দ্র রায়, করগাঁও হইতে যোগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র এবং পরে কাওরাইদের মুরারিদার ছেলে সতেন্দ্র আসিয়া আশ্রমের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। ছেলেদের ভরণ পোষণ অতি সাধারণভাবে আশ্রম হইতেই করা হইত।

যথাসময়ে ১৩২৬ সনের শিবচতুর্দ্দশী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা শান্তিদানন্দ, মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ, যোগানন্দ, অবলানন্দ, সরলানন্দ, ও রামানন্দ, প্রভৃতি সংসার ত্যাগী শিষ্যগণের উপর আশ্রম এবং বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করিয়া ১৩২৭ সনের আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর পর গৌরী আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার পর আর তিনি কখনও লক্ষ্মায়া সিদ্ধাশ্রমে পদার্পণ করেন নাই।

এই সময় হইতে ব্রহ্মচারীবাবা উৎসবের সময় ছাড়া কোন আশ্রমে বেশীদিন বাস করিতে পারিতেন না ; শিষ্য ও ভক্তগণের আগ্রহ এবং অনুরোধে কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা উপবিভাগের গ্রামে গ্রামে ব্রহ্মচারীবাবাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তিনি যখন যে গ্রামে যাইতেন, স্ত্রী পুরুষ দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইত, এবং প্রত্যহ যেখানে তিনি সেবা করিতেন, ভক্ত ও শিষ্যগণের সমাগমে সে স্থানটি

একটি মহাতীর্থে পরিণত হইত। অনেক সময় দেখা গিয়াছে অসচ্ছল শিষ্যের আগ্রহে তাহার বাড়ীতে ব্রহ্মচারীবাবা ভক্তগণ সহ উপস্থিত হইলেও মহোৎসবের কোন অঙ্গহানি হয় নাই। এইভাবে পূর্ব্ববঙ্গের এতদঞ্চলে ব্রহ্মচারীবাবার কঠোর তপস্যা ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একটি অনুপম ভগবৎ চেতনা এবং উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব প্রচারিত হইয়াছিল।

এই সময় শান্তিদানন্দ অধ্যাত্ম বিষয়ক মায়াবাদে প্রভাবান্বিত হইয়া ব্রহ্মচারীবাবার উপদিষ্ট আত্মসমর্পণ যোগের বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার সঙ্গে মতান্তর হইয়া ১৩২৭ সনের আষাঢ় মাসের অম্বুবাচীর পর হইতে আপনভাবে আহার সংযম ইত্যাদি কঠোরতা আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা শান্তিদার এই আহার সংযম ইত্যাদি অনাবশ্যক বোধে তাহা ত্যাগ করাইবার জন্য নিজেও অল্পাহার করিতে আরম্ভ করিলেন; মাত্র কয়েক গ্রাস মুখে দিয়াই উঠিয়া পড়িতেন, শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে ব্রহ্মচারীবাবার শরীর ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু শান্তিদার জেদ্ কিছুতেই কমিল না। এদিকে ব্রহ্মচারীবাবার স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখিয়া অন্যান্য ভক্তগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং তাঁহাকে কিছুকালের জন্য স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গৃহী ভক্তগণের একান্ত অনুরোধে ব্রহ্মচারীবাবা সিদ্ধাশ্রম হইতে রওনা হইয়া

কাঁঠালতলী গ্রাম নিবাসী ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিলেন। গৃহী-ভক্তগণের মধ্যে উপেন্দ্রদা ছিলেন একজন আদর্শ স্থানীয়। ব্রহ্মচারীবাবার প্রতি ছিল তাঁহার অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস। বাবা যে কয়দিন তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিতেন, ভক্তগণের সমাবেশে সে কয়দিন যেন তাহা নিত্য মহোৎসবে পরিণত হইত। উপেন্দ্রদার সম্বন্ধে বাবা বলিতেন—"উপেন্দ্র আমার সাক্ষী রহিল।"

ব্রহ্মচারীবাবার আগমনে সে সময়ে কাঁঠালতলী এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে ধর্ম্মভাবের এক নব জাগরণ দেখা দেয়। গ্রামে গ্রামে নাম সংকীর্ত্তন, পাঠ এবং ধর্ম্মালোচনার বিপুল সাড়া জাগিয়া উঠে। গচিহাটা, বনগ্রাম, মুমুরদিয়া, মসূয়া, কায়স্থপল্লী, সহস্রাম, বেড়াডি, ধূলদিয়া, পুরুড়া, করগাঁও, নিকলী প্রভৃতি গ্রাম সমূহের শত শত ব্যক্তি ব্রহ্মচারীবাবার দর্শন, স্পর্শন ও সাধন প্রভাবে ধর্ম্মালোচনা এবং সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া যেন এক নব জীবনের আস্বাদ লাভ করেন। কর্ম্মযোগ ও ভক্তির সমন্বয় সাধক এই সিদ্ধ মহাপুরুষের পুণ্যময় সান্নিধ্যে আসিয়া শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীউর শিষ্য গচিহাটার শ্রীযুক্তহরেন্দ্রনারায়ণ দত্তরায় (নিদানসাধুজী), মহাত্মা ময়ূর মুকুট বাবার শিষ্য শ্রীযুক্ত নিশীভূষণ দত্তরায়, যোগজীবন গোস্বামীজীর শিষ্য স্বর্গীয় বিধুভূষণ দত্তরায়, দয়ানন্দ স্বামীজীর শিষ্য কাঁঠাল-তলীর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত ছয়না নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মুমুরদিয়ার

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ তালুকদার ৺প্রাণদাশঙ্কর দত্তরায় প্রমুখ তদঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তৎকালে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে বিভোর হইতেন। প্রাণদাবাবু প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মভাবাপন্ন থাকিলেও পরে বাবার অশেষ কৃপালাভ করেন, এবং নিজ বাড়ীতে বাবার আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য সেবা পূজা করিতেন। গচিহাটার শ্রীইন্দুভূষণ (ব্রহ্মচারী) ইতিপূর্ব্বেই ব্রহ্মচারীবাবার দর্শনলাভ করেন। একদা তিনি উক্ত গ্রামের নিশীবাবুর গুরুদেব ময়ুর মুকুট বাবার আসনের সম্মুখে বসিয়া প্রার্থনা করিবার কালে এক সূক্ষ্ম বাণী শুনিতে পাইলেন— "ভারত ব্রহ্মচারী এযুগের মহামহিম পুরুষ, তোমাকে অন্য কোথায়ও যাইতে হইবে না।" ইন্দুভূষণ পূর্ব্বে কিছুদিন শ্রীমৎ নিগমানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে ছিলেন। এই বাণী শ্রবণ করিয়া ১৩২৬ সনের ভাদ্র মাসে তিনি লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রমে গমন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিতে ঠাকুর তাহাকে দীক্ষা প্রদান করেন। গচিহাটার শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র দত্তরায় অপ্রত্যাশিতরূপে বাবার কৃপা লাভ করেন। তিনি একদা বৈরাটী আশ্রমের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, বাবা তাহাকে কৃপা পূর্ব্বক ডাকিয়া আনিয়া দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করেন। গচিহাটার শ্রীসুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ব্রহ্মচারীবাবার কৃপা লাভ করেন। বনগ্রামেরও অনেক ভক্ত ব্রহ্মচারী বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ডাক্তার শ্রীপরেশচন্দ্র চৌধুরী এখনও পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান করিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত বাবার নিত্য সেবা পূজা, ধ্যান ধারণা ও উৎসবাদি করিয়া আসিতেছেন। উক্ত গ্রামের

বিশিষ্ট কায়স্থ তালুকদার শ্রীযুক্তযদুনাথ রায় মহাশয় ব্রহ্মচারী-বাবার কৃপালাভ করিবার পর কয়েক বৎসর নিজ বাটীতে আপন পৌরোহিত্যে শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতিতে যথোচিত সমারোহে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করেন। তৎকালে রায় মহাশয়ের এবম্বিধ পূজা পদ্ধতি কাহারও কাহারও সমালোচনার বিষয়ীভূত হইলেও, অনেক স্থলেই এক নূতন আদর্শের ইঙ্গিত দিতে সমর্থ হইয়াছিল। উক্ত গ্রামের শ্রীমন্মথনাথ রায় মহাশয়ের মাতা ৺সুশীলাসুন্দরী রায় বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত আজীবন সাধন ভজন ও ঠাকুরের সেবার্চ্চনা করিয়া কাটাইয়াছেন।

গচিহাটার নিকটবর্ত্তী সহস্রাম, ধুলদিয়া, বেড়াডি প্রভৃতি গ্রামে ব্রহ্মচারীবাবার অনেক শিষ্য ও ভক্ত আছেন। সহস্রামের মহেশচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় বাবার নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি একজন একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী ছিলেন; বনগ্রাম স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যের জন্য তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ধুলদিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত মথুরচন্দ্র সাহা ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষার পর স্বপ্নে দীক্ষা প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা বাল্যকালে স্বপ্নাদিষ্ট হন—"ভারতব্রহ্মচারী মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা লও।" বাবার এক শিষ্য ধুলদিয়ার হরচন্দ্র নমদাস ভক্তের আগ্রহে তিনি একবার ধুলদিয়া গ্রামে পদার্পণ করিলে, বালক সতীশ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয় এবং ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়। ধুলাদিয়া, বেড়াডি প্রভৃতি গ্রামের বহু ব্যক্তি সেই সময় এই পতিত

পাবন মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া নানাপ্রকার সামাজিক কুশাসন ও ধর্ম্মের গ্লানিকর দুর্নীতি হইতে মুক্ত হন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হন।

ব্রহ্মচারী বাবার ধুলদিয়ায় শুভাগমন বার্ত্তা শুনিয়া নিকলীর ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং শ্রীপতি আচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণের নেতৃত্বে এক বিরাট কীর্ত্তনের দল গঠন করিয়া নাম সংকীর্ত্তন সহযোগে বাবাকে মহানন্দে তাহাদের স্বগ্রামে লইয়া যান। পথি পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসিগণও এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়া পরম শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুস্থান, পাকিস্থানের স্বপ্ন মানুষ দেখে নাই—হিন্দু মুসলমান ছিল ভাই ভাই। ধর্ম্ম, রাজনীতি কিম্বা সামাজনীতি কোন ব্যাপারেই এক ঠাঁই মিলিত হইতে দ্বিধাগ্রস্থ হইত না কেহই। মুসলমানের পীর, দরগা, মসজিদ্ এবং হিন্দুর সাধু সন্ত বা দেবমন্দিরকে উভয় সম্প্রদায়ই অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে জানিত। ব্রহ্মচারীবাবার প্রশান্ত হৃদয়ে যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি থাকিতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। এজন্য তাঁহার মুসলমান ভক্তও ছিলেন অনেক—যাঁহারা সরল ভাবে আপন আপন কথা তাঁহার কাছে নিঃসঙ্কোচে নিবেদন করিতেন, এবং বাবার আদেশ ও উপদেশে শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতেন।

ব্রহ্মচারীবাবা নিকলী গমন করিলে গ্রামবাসিগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করেন। শ্রীমৎরামানন্দজীর শিষ্য তথাকার শ্রীযুক্ত সখীচরণ সাহা বাবার একজন পরম ভক্ত।

মুরারিমোহন সাহা, শ্রীমথুরচন্দ্র সাহা, শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা, ৺মনোমোহন সাহা, শ্রীশরৎচন্দ্র নাথ, শ্রীনিবারণচন্দ্র নাথ, শ্রীপতি আচার্য্য প্রমুখ বহু ভক্ত সে সময়ে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হন।

যদিও ভক্তগণের অনুরোধেই ব্রহ্মচারীবাবা সময় সময় এই-রূপ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই পল্লীপরিক্রমার মধ্যে এক বিশেষ ঐশ্বরিক শক্তির পরিচয় গ্রামবাসিগণ সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতে পারিতেন। তৎকালে বহু পল্লী-গ্রামে নানা প্রকার সামাজিক কুসংস্কার ও দুর্নীতি, এবং ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারাদি অবলীলাক্রমে চলিত। ঠাকুরের পুণ্য স্পর্শে বহু গ্রাম হইতে এই সমস্ত পাপাচার চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া ধর্ম্মের সনাতন আদর্শ এবং পল্লী-উন্নয়ন, সমাজ-সেবা জাতীয়-সংগঠন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুন প্রবর্ত্তন ঘটে।

ভক্ত ও শিষ্যগণের ঐকান্তিক আগ্রহজনিত এইরূপ ভ্রমণ পরিসমাপ্ত হওয়ার পর ১৩২৭ সনের মাঝামাঝি তিনি বৈরাটী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। শান্তিদানন্দ ইতঃপূর্ব্বেই কাঁঠালতলী গ্রামে আসিয়া ঠাকুরের সহিত মিলিত হন। ঐ সনের দীপান্বিতা তিথিতে গৌরী-আশ্রমে শ্রীশ্রীভারতেশ্বরী মহামায়ার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব, কলেবর পরিবর্ত্তন ও পূজার্চ্চনা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। শান্তিদানন্দ আশ্রমের কোন উৎসবেই অন্তরের সহিত যোগ দিতে পারিলেন না। ক্রমে আশ্রমের সংসারত্যাগী যুবকবৃন্দ শান্তিদানন্দের মায়াবাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইল।

ফলে সিদ্ধাশ্রমের ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় ও অন্যান্য কার্য্যে শিথিলতা আসিল। বৈরাটী গ্রামেরও অনেকে শান্তিদানন্দের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইল। এই নব গঠিত মায়াবাদ মূলক অদ্বৈতবাদী দলের মতে কর্ম্ম জ্ঞান লাভের পরিপন্থী বলিয়া কথিত হইত। ইহাতে আশ্রমের অন্য কাজ তো দূরের কথা, নিত্য সেবা পূজা ভোগ আরতি প্রভৃতি কাজে পর্য্যন্ত অমনোযোগ দেখা দিল।

১৩২৭ সনের শেষভাগে গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং দেশে তাঁত ও চড়কা প্রচলনের এক হিড়িক চলিতে থাকে। তদঞ্চলের নেতৃবৃন্দ তের চৌদ্দ জন স্বেচ্ছাসেবককে বয়ন-কার্য্য শিক্ষার জন্য বৈরাটী গ্রাম নিবাসী শ্রীমতিরাম নাথের নিকট পাঠাইয়া দেন। অন্য জায়গায় সুবিধা না থাকায় স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয় গৌরী-আশ্রমেই প্রসাদ পাইতে থাকে।

আশ্রমের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রহ্মচারীবাবা যখন বুঝিলেন যে শান্তিদানন্দ, সরলানন্দ প্রভৃতি যুবকবৃন্দ তাঁহার উপদিষ্ট পথে চলিতে সক্ষম হইতেছে না, তখন তাহাদিগকে পর্য্যটনে যাইতে আদেশ দিলেন। শান্তিদানন্দ ও তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী পর্য্যটনে যাইতে বাধ্য হইলেন। শান্তিদানন্দ সরলানন্দকে সঙ্গে লইয়া গৌরী-আশ্রম হইতে কামাখ্যা অভিমুখে রওনা হইলেন। ব্রহ্মচারীবাবার লিখিত আদেশ ও উপদেশ অনুসারে ক্রমে মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ, যোগানন্দ, শঙ্করানন্দ, বিরজানন্দ প্রভৃতিও সিদ্ধাশ্রম হইতে পর্য্যটনে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে সকলেই

ব্রহ্মচারীর বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতঃ ১৩২৭ সনের চৈত্র মাসে পর্য্যটনে বাহির হইলেন। এই বিদায়ের দৃশ্য তৎকালে বিশেষ বিষাদ-করুণ হইয়াছিল। সুকণ্ঠ গায়ক শান্তিদানন্দ বিদায়ের প্রাক্কালে একটি স্বরচিত সঙ্গীত গাহিলেন ঃ—

অপরাধী বলে চরণে ঠেলে
যেয়োনা ফেলে এ কাঙ্গালে।
জ্ঞানময় গুরু কৃপা কল্পতরু
দয়ালের শিরোরতন ভূতলে॥
প্রেম অবতার জানি তুমি দেব,
তুঃখেরি জীবন আর কারে দিব,
কা'রেবা শুধাব, কা'রেবা বলিব,
স্নেহ ঢেলে আর কে নিবে কোলে॥
.... ইত্যাদি।

এইসব পোষাপাখীর মত যুবক ব্রহ্মচারিগণকে নিঃসম্বল অবস্থায় কঠোর পর্য্যটনে পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারীবাবা প্রায়ই নির্জ্জনে একাকী অবস্থান করিতেন। আশ্রমবাসিগণ বলিয়াছিলেন যে, এইসময় ব্রহ্মচারীবাবা প্রায়ই এই গানটি গাহিতেন—"আমার প্রাণ পাখী গিয়াছে উড়িয়া"—এবং চক্ষের জলে ভাসিতেন। কিন্তু জগন্মাতার আদেশেই তিনি এত কঠোর হইতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ কোন মঙ্গলোদ্দেশ্যে মায়ের আদেশ বলিয়াই সকলে তদনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এ

পর্য্যটনে ব্যক্তিগতভাবে যোগানন্দের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন লাভে খুবই উপকার হইয়াছিল। অন্যান্য পর্য্যটকগণও তাঁহাদের দীর্ঘ ভ্রমণকালের মধ্যে বিভিন্নস্থানে অনেক মহাত্মার এবং বাবার বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবার বিস্তৃত জীবন-চরিতে সে সমস্ত উল্লেখিত হইবে।

ব্রহ্মচারীবাবা বয়ন-বিদ্যা শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবকদের সুবিধার জন্য বৈরাটী গৌরী-আশ্রমেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেদার সরকার (কুমুদানন্দ) ও সুশীলানন্দকে সিদ্ধাশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া আশ্রমের তত্ত্বাবধান ও শ্রীমান্ যোগেন্দ্র, সুরেন্দ্র প্রভৃতির লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা ১৩২৮ সনে মায়ের আদেশে বৈরাটী গ্রামে বস্ত্রবয়ন শিক্ষা প্রদানে বিশেষ মনোযোগ করিলেন। এই শিক্ষাদান কার্য্যে ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেস কমিটি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ২৫০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করেন। কিছুকাল পরে কংগ্রেস কমিটির সহায়তায় নেত্রকোণা সহরেও তাঁতের কাজ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। এইরূপে দুই বৎসরে ন্যূনাধিক চারিশত ছাত্রকে আশ্রম হইতে আহার্য্য ও সুতা খরচ দিয়া বিনা বেতনে তাঁত বয়ন শিক্ষা প্রদান করিতে আট হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়াছিল। ত্রিশ চল্লিশখানি তাঁত এবং হাসামপুর কেন্দ্র হইতে প্রায় এক হাজার টাকা ব্যয়ে পাঁচ ছয়শত চরকা তৈয়ারী করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের সদর মহকুমা হইতে আশ্রমবাসী ভিক্ষুক দ্বারা ভিক্ষালব্ধ অর্থে এই বিরাট কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

১৩২৮ সনের মধ্যভাগে ব্রহ্মচারী বাবা নেত্রকোণা সহরে কংগ্রেস কমিটির আহ্বানে বয়নকার্য্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সুশীলানন্দ এবং শ্রীমান্ হরেন্দ্র ও রাজেন্দ্রকে শিক্ষকরূপে পাঠান হয়। ক্রমে সিদ্ধাশ্রমের ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের ছেলেদিগকেও নেত্রকোণা সহরে পাঠাইয়া দেন। গচিহাটার ৺মণিভূষণ দত্তরায়ও তখন এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। সেখানে জনৈক কাব্যতীর্থ পণ্ডিত ও কেদার (কুমুদানন্দ) তাহাদের শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত হন। নেত্রকোণা জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভদ্র মহাশয় এই বিষয়ে খুব উৎসাহী ও সাহায্যকারী ছিলেন। উমেশবাবু বাবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান, এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্যে সাহায্য করিয়া নিজে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। ছাত্রদের তত্ত্বাবধান ও সেবা পূজার সাহায্যের জন্য ব্রহ্মচারী বাবার আদেশ ও উপদেশে সুধীরানন্দ এবং হেমদা তথায় গমন করেন। ইহারা সর্ব্বপ্রথম নেত্রকোণা সহরে দৈনিক পাঁচবাসায় ভিক্ষা এবং পরে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহেও এই ভিক্ষার প্রচলন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আহারের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে স্বর্গীয় অজপানন্দ নেত্রকোণার বয়ন-বিদ্যালয় ও ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য ব্রহ্মচারী বাবার অনুমতিক্রমে যোগদান করেন। ব্রহ্মচারীবাবা এই সময় নেত্রকোণার অন্তর্গত কালিয়ারা গ্রামের শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন জানিয়া নেত্রকোণা কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট কর্ম্মী ও স্থানীয় খ্যাতনামা উকিল

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দেব প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি তথায় গমন করতঃ ব্রহ্মচারীবাবাকে নেত্রকোণা সহরে আনিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। বহুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীবাবা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে—'নেত্রকোণা প্রচারের দ্বার।' নগেন্দ্রবাবুদের অনুরোধে তিনি নেত্রকোণা সহরে আসিয়া নগেন্দ্রবাবুর বাসা-বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ অনতিবিলম্বেই সহরময় ছড়াইয়া পড়িল এবং আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে তাঁহার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় নগেন্দ্রবাবুর বাসায় উপনীত হইতে লাগিলেন। সেই সময় বয়ন-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানাভাব ঘটিলে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে নেত্রকোণার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বর্গীয় চিত্রমোহন সাহারায় মগরা নদীর তীরবর্ত্তী তাঁহার পুরাতন বাড়ীটি এই সৎকার্য্যের জন্য দান করিতে সম্মত হন।

১৩২৯ সনের প্রথম ভাগে নেত্রাকাণা সহরের দক্ষিণে একমাইল দূরে মগরা নদীর তীরে মালনী গ্রামে স্বর্গীয় চিত্রমোহন সাহা রায়ের পতিত বাড়ীতে সহরের বয়ন বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করা হয়। চিত্রবাবুর বিশেষ প্রার্থনায় ব্রহ্মচারী বাবা এখানে শুভ পদার্পণ করেন, এবং তাহার এই পতিত বাড়ীটি দেবোত্তর প্রদান করিলে ব্রহ্মচারী বাবা এইস্থানে চিত্রবাবুর নামে—"চিত্রধাম-আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি এখানে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং তৎকালে নেত্রকোণার নিকটবর্ত্তী হাসামপুর, লক্ষ্মীগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের শিষ্য

শ্রীশ্রীপাগলনাথ দেবালয়
লক্ষীয়া—সিদ্ধাশ্রম।

৩৪ পৃঃ

গৌরী আশ্রম—বৈরাটী।

২৯ পৃঃ

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দেব প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি তথায় গমন করতঃ ব্রহ্মচারীবাবাকে নেত্রকোণা সহরে আনিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। বহুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীবাবা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে—'নেত্রকোণা প্রচারের দ্বার।' নগেন্দ্রবাবুদের অনুরোধে তিনি নেত্রকোণা সহরে আসিয়া নগেন্দ্রবাবুর বাসা-বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ অনতিবিলম্বেই সহরময় ছড়াইয়া পড়িল এবং আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে তাঁহার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় নগেন্দ্রবাবুর বাসায় উপনীত হইতে লাগিলেন। সেই সময় বয়ন-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানাভাব ঘটিলে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে নেত্রকোণার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বর্গীয় চিত্রমোহন সাহারায় মগরা নদীর তীরবর্ত্তী তাঁহার পুরাতন বাড়ীটি এই সৎকার্য্যের জন্য দান করিতে সম্মত হন।

১৩২৯ সনের প্রথম ভাগে নেত্রাকাণা সহরের দক্ষিণে একমাইল দূরে মগরা নদীর তীরে মালনী গ্রামে স্বর্গীয় চিত্রমোহন সাহা রায়ের পতিত বাড়ীতে সহরের বয়ন বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করা হয়। চিত্রবাবুর বিশেষ প্রার্থনায় ব্রহ্মচারী বাবা এখানে শুভ পদার্পণ করেন, এবং তাহার এই পতিত বাড়ীটি দেবোত্তর প্রদান করিলে ব্রহ্মচারী বাবা এইস্থানে চিত্রবাবুর নামে—"চিত্রধাম-আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি এখানে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং তৎকালে নেত্রকোণার নিকটবর্ত্তী হাসামপুর, লক্ষীগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের শিষ্য

শ্রীশ্রীপাগলনাথ দেবালয়
লক্ষ্মীয়া—সিদ্ধাশ্রম। ৩৪ পৃঃ
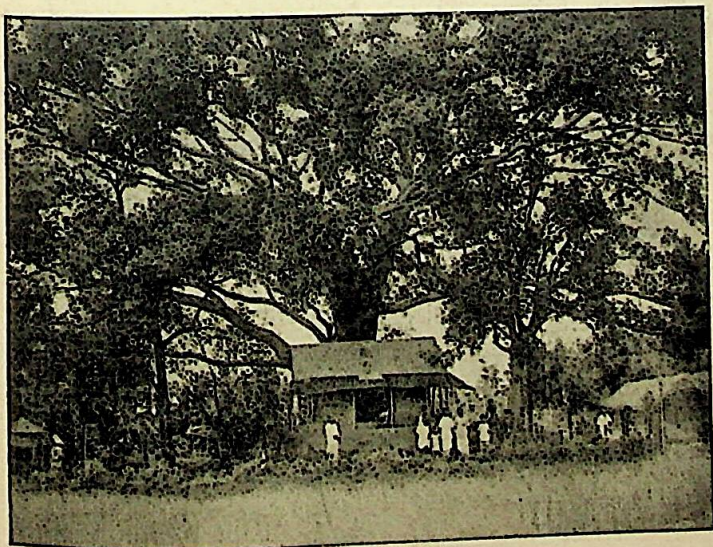
গৌরী আশ্রম—বৈরাটী। ২৯ পৃঃ

জন্মভূমি ও যোগভূমি—জগদল।

১ম পৃষ্ঠা।
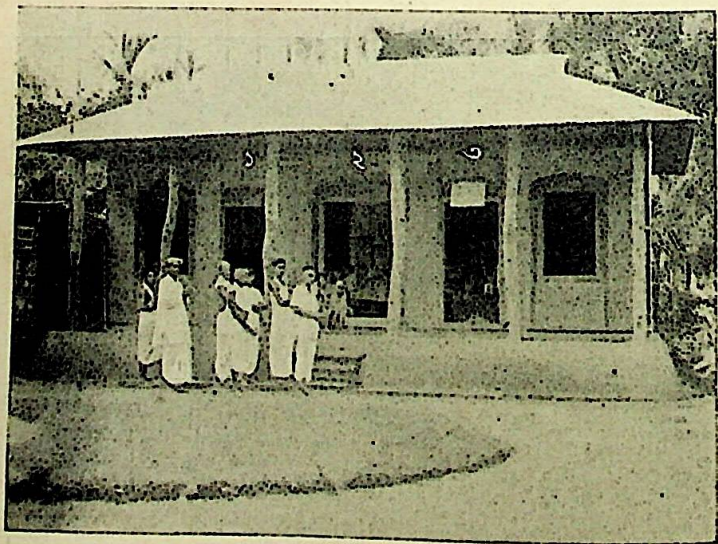
চিত্রধাম আশ্রম, মালনী—নেত্রকোণা। ৫২ পৃঃ

(১) শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকৃষ্ণ, (২) শ্রীশ্রীদশভুজাদুর্গা, (৩) ব্রহ্মচারীবাবার মহাসমাধি।

ও ভক্তগণের অনুরোধে তাহাদের বাড়ীতেও গিয়াছিলেন।

নেত্রকোণার নিকটবর্ত্তী গঙ্গানগর, শ্রীপুর, হাসামপুর, বাইশদ্বার, লক্ষ্মীগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম সমূহের স্ত্রী পুরুষ অনেকেই ব্রহ্মচারীবাবার মন্ত্র-শিষ্য অথবা ভক্তও অনুরক্ত ছিলেন। এই সমস্ত গ্রামে ব্রহ্মচারীবাবা বহুবার শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। আশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মী ও সাধক হেমদার বাড়ী গঙ্গানগর গ্রামে। বাল্যকালেই হেমদা ব্রহ্মচারী বাবার দিব্য সঙ্গ প্রভাবে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বাড়ীতেই সাধনা আরম্ভ করেন। ব্রহ্মচারীবাবা বহুবার তাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন এবং ঐ গ্রামের অনেকে তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবে দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করেন। গঙ্গানগরের শ্রীযুক্ত অমর ডাক্তার বাবার বিশেষ ভক্ত শিষ্য। এতদঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে ব্রহ্মচারী বাবার উপদেশানুসারে আশ্রমোচিত আসন স্থাপন ও সদাচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদর্শ প্রতিপালনে হাসামপুরের সরকার পরিবারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় নকুলচন্দ্র সরকার মহাশয় ও সুরেশ সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে স্ত্রী পুরুষ ছেলে মেয়ে প্রায় সকলেই ব্রহ্মচারীবাবার মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। তাহাদের বাড়ীতে নিত্য নিয়মিত সেবা পূজা ও ভোগ আরতি এবং আশ্রমোচিত নিয়ম প্রতিপালিত হইত। নকুলবাবুর বাড়ীতে ব্রহ্মচারীবাবা বেদ প্রতিষ্ঠা করেন। ৺অজপানন্দ * এখানে নিয়মিত বেদাধ্যয়ন করিতেন। তাহারা গৃহীভক্ত হইলেও আদর্শ গার্হস্থ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকা সকলেই আশ্রমোচিত সদাচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি হাসামপুর তাঁতের কেন্দ্র সুরেশদার বাড়ীতে ছিল। লক্ষ্মীগঞ্জ কাছারির নায়েব ৺মহেন্দ্রচন্দ্র সরকার ব্রহ্মচারী বাবার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁহার পরিবারের সকলেই ব্রহ্মচারীবাবার মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। দেশের কাজে এবং ব্রহ্মচারী বাবার আদর্শোচিত পল্লীসংগঠন কার্য্যে তাহাদের খুবই আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। নায়েব মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী লীলাবতী সরকার ব্রহ্মচারী বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতে সেবাপূজাদি খুব নিষ্ঠার সহিত করিত। ব্রহ্মচারীবাবাও লীলাবতীকে সাধনায় যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহিত করিতেন। তিনি এই কাছারি বাড়ীতে কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারীবাবা নেত্রকোণা চিত্রধাম আশ্রমে অবস্থানকালে হাসামপুরের স্ত্রী পুরুষ বালক যুবা সকল শিষ্যগণের আত্যন্তিক আগ্রহে এই গ্রামটিকে একটি আর্যোচিত আদর্শ পল্লীরূপে সংগঠন করিবার জন্য অনেকবার তথায় যাতায়াত করিয়াছেন। তাহাদের সাহায্যার্থে এক সময় কিছুদিনের জন্য যোগানন্দ ও কুমুদানন্দকে (কেদার) ওখানে রাখিয়াছিলেন।

---

* অজপানন্দ (অশ্বিনীকুমার ধর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, বুধপাশা) ইতিপূর্ব্বেই তাহার আধ্যাত্মিক জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনা আরম্ভ করেন। নেত্রকোণায়ই তাহার পাঠ্যজীবন অতিবাহিত হয় এবং পরে তিনি তাহার অগ্রজের সহিত নেত্রকোণা বাসায় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় সাহায্য করিতেছিলেন। কিন্তু তাহার ভগবৎ জীবন লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সাংসারিক জীবনে আর

এইভাবে ব্রহ্মচারীবাবা নেত্রকোণা উপবিভাগের পূর্ব্বাঞ্চলে বহুগ্রামে পদব্রজে ও নৌকাযোগে পরিভ্রমণ করেন। খালিয়া-জুরী গ্রামে ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, স্বর্গীয় শচীন্দ্রচন্দ্র রায়, মনোমোহনদা (মোক্ষদানন্দ), রজনীদা (বিরজানন্দ) প্রভৃতি শিষ্যগণের বাড়ীতে তিনি গমন করিয়াছিলেন। এইভাবে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সর্ব্বত্র তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল।

১৩২৬ সন হইতে পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে এইসব অঞ্চলের নানা গ্রামে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। যখন যে গ্রামে যাইতেন সেই গ্রামে এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে বিশেষ সাড়া পড়িত। লোকে বলিত, 'গ্রাম চুক্তি'—অর্থাৎ গ্রামের স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা প্রায় সকলেই তাঁহার দিব্য প্রভাব ও আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া মন্ত্র গ্রহণ করিত। সকলেরই প্রাণে যেন একটি অনির্ব্বচনীয় নবজীবনের চেতনা অনুভব করিত। ব্রহ্ম-চারীবাবা জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে, স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা নির্ব্বিশেষে, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি সকলকেই আর্য্য আদর্শে বৈদিক ও তান্ত্রিক মতে দীক্ষা দান করিতেন। তিনি বহু শিষ্যকে উপনয়ন সংস্কার প্রদান পূর্ব্বক দীক্ষিত করিয়াছেন। তাঁহার কাছে কোনরূপ বর্ণভেদ ও সাম্প্র-

---

তেমন ছন্দ মিলাইতে পারেন নাই। এই সময় নেত্রকোণা গুরুদেবের প্রতিষ্ঠানের কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় তিনি অন্তরের প্রেরণায় এবং ব্রহ্মচারী বাবার অনুমতিক্রমে সংসার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী বাবার কার্য্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অতি নিষ্ঠাবান্ ও সদাচারী তপস্বী

দায়িকতার বৈষম্য ছিল না। তিনি ছিলেন পতিতের, অনুন্নতের, অস্পৃশ্যের পতিত পাবন, অধমতারণ মহাপ্রেমিক দীনবন্ধু, করুণার আধার! বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের তিনি ছিলেন পরম আপনার জন। স্ত্রী শিষ্যগণ ব্রহ্মচারীবাবার নিকট নিজেদের মনের কথা বলিতে পারিয়া হাঁপ ছাড়িত। এমন কি স্বামীকে পর্য্যন্ত যে কথা বলিতে পারিতনা, নিঃসঙ্কোচে তাহা ব্রহ্মচারীবাবার কাছে বলিয়া শান্তি পাইত। ব্রহ্মচারীবাবা তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন যে, দুই একটি সন্তান হইলে পরে যেন তাহারা স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধভাবে আর না থাকে; ভাই বোন হিসাবে থাকে। সংসারের যাবতীয় কার্য্য, খুটিনাটি সমস্ত কাজ-কর্ম্ম যেন ভগবানের উদ্দেশ্যে, মা'র উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়, মা'তে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সদাচারী সংযমী হইয়া নিষ্কাম ভাবে মা'র জন্য ঘর সংসার করিতে অভ্যস্থা হয়। ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেন যে, মেয়েরা উন্নত না হইলে, মেয়েদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিকাশে সাহায্য না করিলে এই অধঃপতিত জাতি ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও অভ্যুত্থান অসম্ভব।

সাধক ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মচারীবাবার নিজের লেখাপড়ার কার্য্যে অজপানন্দই ছিলেন প্রধান সাহায্যকারী। ব্রহ্মচারীবাবা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত "সোনার-ভারত" পত্রিকার অজপানন্দই ছিলেন সম্পাদক। ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগের পর তাঁহার প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণের মধ্যে অজপানন্দেরই উৎসাহ উদ্দীপনা ও সাহায্য ছিল সবচেয়ে বেশী। সংসারত্যাগীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সংসারী

কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা উপবিভাগে ব্রহ্মচারীবাবার প্রায় দশ সহস্র মন্ত্র-শিষ্য আছেন। ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে চারি পাঁচ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সর্ব্বদাই থাকিতেন। তাঁহাদের ও গ্রামবাসীদের সাহায্যে ভোগ ও সেবাপূজা অতি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন হইত। সেবাপূজা, ভোগ আরতি ও প্রসাদ বিতরণে কোন হট্টগোল বা আরম্বর ছিল না। অতি সাধারণভাবে সকল কার্য্য ও সেবাপূজা সম্পন্ন হইত। ভোগের জন্য সাধারণ চাউলের অন্ন, একটি ডাল, একটি তরকারী বা লাব্‌ড়া ও সুক্ত যথেষ্ট। আহুত অনাহুত রবাহুত শত দুইশত ভক্ত, কোন সময় বা আরও বেশী সংখ্যক ভক্ত প্রসাদ পাইতেন। সে কি আনন্দ ও উৎসাহপূর্ণ ভাব, অথচ সকলের শান্ত দিব্য মিলন, যেন এক অনির্ব্বচনীয় উর্দ্ধ চেতনা ও দেব জীবনের সমাবেশ হইত! যাহার বাড়ীতে যখন ব্রহ্মচারীবাবা অবস্থান করিতেন, সেই ভাগ্যবান ভক্ত নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তথাকথিত শিক্ষায় ব্রহ্মচারীবাবা শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি কোন বক্তৃতা করিতেন না, কথাও খুব কমই বলিতেন, স্বল্প ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার মধ্যে আমরা ভাবাবেগ দেখি নাই। তিনি ছিলেন কঠোরতপা যোগী, আর্য্য-ঋষি সুলভ শান্তস্বভাব সম্পন্ন, মাধুর্য্যপূর্ণ, মহিমান্বিত

গুরুভাইগণের সাহায্যকারী এবং প্রধান কর্ম্মী। তাহার ক্ষীণ শরীরে কর্ম্মশক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহ বিদ্যমান ছিল, তাহার মুখে ছিল সর্ব্বদা হাসি। "সোনার-ভারত" পত্রিকা বন্ধ হইয়া গেল ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগের পর। ১৩৩৬ সনের কার্ত্তিক মাসে তিনি আবার "ভারত-সমাজ" পত্রিকা

করুণার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার এই দেবোপম সঙ্গ এবং কৃপা পাইবার জন্য স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের অত্যন্ত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভক্তগণের মধ্যে কখন কে তাঁহাকে আপন বাড়ীতে লইয়া যাইবেন, সেই আগ্রহে সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত থাকিতেন। ব্রহ্মচারীবাবাকে লইয়া যাইবার জন্য গৃহী শিষ্যদের মধ্যে সর্ব্বদা রীতিমত একটি মানসিক দ্বন্দ্ব চলিত, কে কাহার আগে সে সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিবেন। এইভাবে অত্যধিক পরিশ্রমে এবং আপামর সর্ব্বসাধারণের সহিত সংমিশ্রণে তাঁহার শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িল। তিনি পদব্রজে চলিতে আর সমর্থ ছিলেন না, পাল্কীতে ও উঠিতেন না। তাই ডুলি বা সোয়ারী করিয়া এবং বর্ষাকালে নৌকাযোগে ভক্তগণের বাড়ীতে যাইতেন। পারতপক্ষে ব্রহ্মচারীবাবা কাহাকেও নিরাশ করিতেন না, যতদূর সম্ভব সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। ভক্তের অন্তরের ডাক তাঁহার করুণা বিগলিত হৃদয়কে নিয়তই স্পর্শ করিত। এ প্রসঙ্গে একদিনের ঘটনা উল্লেখ করি।

শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়ের মাতা স্বর্গীয়া সুখময়ী দত্তরায়

প্রকাশ করিলেন। এই সনেই অজপানন্দের বিশেষ প্রেরণায় শঙ্করানন্দ ও যোগানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ নেত্রকোণা কংগ্রেস কমিটির লবন আইন অমান্যকারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেন। উক্ত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শান্তিনাথ মজুমদার মহাশয়ের নেতৃত্বে কলিকাতা যাইয়া বি, পি, সি, সি-'র নির্দ্দেশে কালিকাপুর কেন্দ্রে লবন প্রস্তুত করেন, এবং সরকার উক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে গ্রেপ্তার করিয়া

একজন ধর্ম্মপরায়ণা একনিষ্ঠা সাধিকা ছিলেন। পুত্রের নিকট তাহার গুরুদেবের কথা শুনিয়া প্রায়ই বলিতেন—"তোর ঠাকুরকে দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হয়, একবার তাঁহাকে দেখা না।" কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবাকে তাহাদের বাড়ীতে আনিবার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারায় মায়ের মনোবাসনা পূর্ণ করা পূর্ণেন্দু-ভূষণের পক্ষে বহুদিন যাবৎ সম্ভবপর হইতেছিলনা। ব্রহ্মচারী বাবা ১৩২৭ সনের আষাঢ় মাসে লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রম হইতে বৈরাটী গৌরী-আশ্রমে যাওয়ার কালে পথে কাঁঠালতলী, বন-গ্রাম ও সহস্রামের ভক্তগণের বাড়ীতে এক দুইদিন অবস্থান করতঃ একদা শিষ্য ও ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া গচিহাটা ষ্টেশনে আসিলেন—তথা হইতে সকলে ট্রেন ধরিবেন ইহাই ইচ্ছা। কিন্তু ষ্টেশনের প্লাটফরমের নিবটবর্ত্তী হইতে না হইতেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। বাবা ষ্টেশনের বিশ্রাম কক্ষের বেঞ্চিতে যাইয়া বসিলেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পূর্ণেন্দুভূষণ ইতঃপূর্ব্বে কাঁঠালতলী গ্রাম হইতেই এই কয়দিন ঠাকুরের সঙ্গ করিয়া চলিয়াছেন। তিনিও সে সময় ষ্টেশনে বাবার পার্শ্বেই দণ্ডায়মান। এমন সময় ব্রহ্মচারীবাবা হঠাৎ দাঁড়াইলেন এবং তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন

জেলে প্রেরণ করেন। গ্রেপ্তারের পর এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রত্যেককে পুলিশ ভীষণ প্রহার করে। সেই প্রহারের আঘাতে দুই এক জনের স্বাস্থ্য ও জীবন চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খুবই পরিতাপের বিষয়, অজ্ঞপানন্দের উৎসাহ ও প্রেরণায় আশ্রমবাসী শিষ্যগণ

—"চল তোদের বাড়ী যাব।" ব্রহ্মচারীবাবার অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া পূর্ণেন্দুবাবুর মাতা আনন্দে বিভোর হইলেন। সমস্ত রাত্রি তিনি বাবার সহিত বহু ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন। পূর্ণেন্দুভূষণের মা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা, মা আপনার সাথে কথা বলেন বলছেন, সে কি রকম?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"যেমন আপনি আমার সাথে কথা বলছেন, মা ও আমার সঙ্গে তেমনই কথা বলে থাকেন।" বাক্যাদেশ বা ভগবদাদেশ কি রকমে পাইয়া থাকেন জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"যেমন আমরা ঘরে বসে আছি, এই ঘরের বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে কেহ কিছু বললে যেমন স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়, বাক্যাদেশ আমি তেমনই স্পষ্ট শুনি।" ব্রহ্মচারীবাবার জীবনের এইরূপ শত সহস্র ঘটনা ও বাণী তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট রহিয়াছে, যাহা আপাততঃ সংগৃহীত করা এবং এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর হইলনা।

বোরগাঁওবাসী রাউত ও বিশ্বাস পরিবারের অনেকেই ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। তথাকার শ্রীহরিপদ বিশ্বাস, শ্রীনগেন্দ্রনাথ রাউত, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রাউত, শ্রীগিরিবালা রাউত, শ্রীসুরবালা রাউত প্রমুখ শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের আগ্রহে বাবা উক্ত গ্রামে একবার পদার্পণ করিয়াছিলেন।

লবণ আইন অমান্যকারী স্বচ্ছাবাহিনীতে যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রধামে তাঁহার জ্বর ও আমাশয় হয় এবং দুই একদিনের জ্বর আমাশায়ে তিনি দেহত্যাগ করেন। যোগানন্দ পথে তাহার মৃত্যু সংবাদের টেলিগ্রাম

১৩৩১ সনের বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার তুই একদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীবাবা গৌরী-আশ্রম হইতে মায়ের আদেশে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম যাত্রা করিয়া আমতলা গ্রাম নিবাসী দশরথদার বাড়ীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়ের পূজার জন্য কয়েক দিন অপেক্ষা করেন। কিন্তু অক্ষয় তৃতীয়াতে কারীকর মায়ের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে দশরথদা ব্যস্ত হইয়া ব্রহ্মচারীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "বাবা, অক্ষয় তৃতীয়া চলিয়া যাইতেছে, মায়ের মূর্ত্তি এখনো নির্ম্মিত হয় নাই, মায়ের পূজার কি হইবে?" ইহাতে ব্রচহ্মারীবাবা বলিলেন যে, মা আমাকে বলিয়াছেন,— "তুই যে তিথিতেই আমার পূজা করিবে সেই তিথিই অক্ষয় তিথি হইবে।" ব্রহ্মচারীবাবা আরও বলিলেন যে,—"শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ বিধানগুলি ঋষিরাই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; তোমার বাড়ীতে মায়ের পূজা অক্ষয় চতুর্থীতে সম্পন্ন হইল।"

শ্রীবৃন্দাবন যাত্রাকালে ব্রহ্মচারীবাবার ভাগিনেয়ী কুমুদিনী, ভাগিনেয়ীর জামাতা গোবিন্দদা ও ভাগিনেয়ীর কন্যা কুমারী সুমতিবালা মায়ের আদেশক্রমে তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। ব্রহ্মচারীবাবা নিষেধ করা সত্ত্বেও ধীরানন্দ একগোঁয়েমী করিয়া নিজ খরচে ব্রহ্মচারী বাবার সঙ্গে বৃন্দাবন গেলেন। ধীরানন্দ বৃন্দাবনে বেলবনে পৌঁছার দিন কয়েক মধ্যেই প্রবল

পাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন। অখণ্ডানন্দের যেমন ছিল অধ্যাত্ম প্রেরণা তেমনই ছিল দেশাত্মবোধের প্রেরণা। তাহার অকাল মৃত্যুতে আশ্রমের এবং সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

জ্বরে আক্রান্ত হন। ধীরানন্দ নিজেই বলিয়াছেন, বেলবনে লক্ষীমায়ের অঙ্গনে তাহার কোন অপরাধ হয়। ব্রহ্মচারীবাবা তাহাকে অসুস্থ অবস্থায়ই অতি কষ্টে দেশে লইয়া আসেন এবং তাহাকে তাহার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দেন। ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন যে, "বেলবনের ব্রহ্মদৈত্যের হাত হইতে ধীরানন্দ রক্ষা পায় নাই। যাহা হোক, মায়ের বিশেষ কৃপায় সে প্রাণে বাঁচিল।" আমতলায় দশরথদার বাড়ীতে মায়ের পূজা সম্পন্ন করিয়া নেত্রকোণা চিত্রধাম আশ্রমে গমন করেন এবং আশ্রমে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

তৎপর নেত্রকোণা হইতে ট্রেনে মুসুলী ষ্টেশনে নামিয়া নৌকা যোগে সিংরৈল যামিনীদার বাড়ীতে দুই তিন দিন থাকিয়া তথা হইতে নৌকাযোগে ব্রহ্মচারী বাবার জন্ম ও সাধন ভূমি জগদল স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে দুই তিন দিন অবস্থান করেন। জগদল হইতে হোসেনপুর ও তথা হইতে নৌকাযোগে গফরগাঁও ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেনে কাওরাইদ পৌঁছেন এবং ব্রহ্মচারীবাবার অতিশয় প্রিয় ভক্ত মুরারি-মোহনদার বাড়ীতে দিন কতক অবস্থান করিয়া ১৩৩১ সনের ২৪শে শ্রাবণ কাওরাইদ ট্রেন ধরিয়া পথে ৺কাশীধামে দুইদিন ও প্রয়াগে একদিন অবস্থান করতঃ বৃন্দাবনধামে উপনীত হইলেন।

ব্রহ্মচারীবাবা বৃন্দাবনধামের অন্তর্গত বেলবনে শ্রীশ্রীমহা-লক্ষ্মী মায়ের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া আঠারদিন হত্যায় থাকিয়া আকুলভাবে প্রার্থনাদি করিলেন, অতঃপর অহেতুকী কৃপা-

ময়ী শ্রীশ্রীমা মহালক্ষ্মী তাঁহাকে বলিলেন, "ভারতের—তথা সমস্ত জগতের মঙ্গলার্থ প্রকাশিত হইব।" তৎপর আদেশক্রমে শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মায়ের ধাতুমূর্ত্তি এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রস্তরমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতঃ বেল-বনের মহালক্ষ্মীমায়ের মন্দির সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি লইয়া ব্রহ্মচারী বাবা বৃন্দাবন হইতে আশ্বিন মাসে নেত্রকোণা চিত্রধাম আশ্রমে উপনীত হইলেন। তদনন্তর শারদীয়া পূজার সময় শ্রীশ্রীদশভূজা দুর্গার মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি এবং শুভ লক্ষ্মীপূর্ণিমা তিথিতে উপরোক্ত শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী-কৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই সময় হইতে অজপানন্দ ব্রহ্মচারীবাবার শরীর-রক্ষীর মত রহিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন যে, মহালক্ষ্মী মা আবির্ভাবকালে তাঁহাকে অনেক সর্ত্ত করাইয়াছেন। সে সব সর্ত্ত রক্ষিত না হইলে যে কোন সময় মা অন্তর্হিতা হইয়া যাইবেন। সে সব সর্ত্তগুলি মোটামুটি এই,—ব্রহ্মচারীবাবার শরীর কেহই স্পর্শ করিতে পারিবে না—বিশেষ করিয়া মাদক-দ্রব্য সেবনকারী ও অসত্যবাদী তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তাঁহার দেহের উপর দিয়া ঝড় বহিয়া যাইবে। কুমারী মেয়ে দ্বারা মহালক্ষ্মীমায়ের পূজার্চ্চনা ও ভোগরাগ ইত্যাদি করাইতে হইবে,—তাই কুমারী সুমতিবালাই ব্রহ্মচারীবাবার নির্দ্দেশ মত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকৃষ্ণের সেবিকা ছিলেন। নিরামিষ ভোগ হইবে—নানা প্রকার উপাদান ও উপাদেয় দ্রব্য সম্ভারে। বিশেষরূপে নিষিদ্ধ ছিল—আশ্রমে কেহই তামাক খাইতে পারিবে না।

শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর বাবা কয়েক মাস নেত্রকোণার চিত্রধাম আশ্রমে অবস্থান করেন। এই বৎসরের শেষভাগে নেত্রকোণা সহরে জেলা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কিছু জানাইবেন বলিয়া— ব্রহ্মচারীবাবা কুমুদানন্দ দ্বারা "সত্যযুগাঙ্কুর" এবং যোগানন্দ দ্বারা "কংগ্রেস ও পল্লীসংস্কারে আমাদের কথা" পুস্তিকাদ্বয় লিখান এবং অধিবেশনের পূর্ব্বেই তাহা মুদ্রিত হয় এবং ব্রহ্মচারী বাবার আদেশে অজপানন্দ অধিবেশনে পুস্তিকা দ্বয় বিতরণ করেন।

বৃন্দাবনেই ব্রহ্মচারীবাবার উদরাময় রোগ দেখা দেয়, ইহা আর থামিল না। মাঝে মাঝে জ্বর ও কফে আক্রান্ত হইয়া শারীরিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইত, আবার মাঝে মাঝে একটু সুস্থ থাকিতেন। আশ্রমে যথারীতি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা চলিতে-ছিল না। তাহার প্রধান কারণ আর্থিক সাহায্য আশ্রমে কোনদিনই বেশী আসিত না, একমাত্র চাউল ইত্যাদি ভিক্ষার উপরই আশ্রমের ব্যয় মুখ্যতঃ নির্ভর করিত। আশ্রমাদি প্রতি-ষ্ঠানে এতদঞ্চলের সর্ব্বসাধারণ আকতরে আর্থিক সাহায্য দানে কোনকালেই বিশেষ অভ্যস্থ নয়। এমন কি শিষ্যভক্তগণও তেমনভাবে গুরুদেবের আশ্রমে সাহায্য করিতে অভ্যস্থ ছিলেন না। ব্রহ্মচারীবাবার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলির মত দরিদ্র আশ্রম আর কোথাও দেখা যায় না। তিনি নিজে এমনই মা'তে সমর্পিত-চিত্ত এবং এত কঠোরতপা যে, এইরূপ কঠোর অবস্থাতেও নির্ব্বিকার ও উদাসীন থাকিতেন; অথচ সর্ব্বদা

সহাস্যবদন, হয়ত আশ্রমে সারাদিন ভোগই লাগে নাই। তিনি কখনও মুখে কাহাকেও এই অবস্থার কথা বলিতেন না। মানুষী চেতনা কতটুকু জাগ্রত হইলে তবে এই শ্রেণীর মহাপুরুষের লোকব্যবহার ধরাযায় বুঝাযায়, তাহা সর্ব্বসাধারণ কি বুঝিবে ? এইভাবে তিলে তিলে তাঁহার এই তপস্যাপূত দেহ এতদ্দেশে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তিনি জানিতেন শ্রীমার মহাপ্রকাশ হইলে পর দেশের জনসাধারণ সমস্তই জানিবে ও বুঝিবে।

পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে নেত্রকোণার নিকটবর্ত্তী হাসাম-পুরের সরকার পরিবার সমূহ ব্রহ্মচারীবাবার বিশেষ ভক্ত এবং তাহারা আশ্রমোচিত আদর্শে চলিতে চেষ্টা করিতেন। ইতোমধ্যে তাহারা বাবার উপদেশে উপনয়ন সংস্কারন্তে উপবীত ধারণ পূর্ব্বক দ্বিজাচার গ্রহণ করেন। বাড়ীর নিত্যনৈমিত্তিক ঠাকুর পূজা ভোগাদি নিবেদন ইত্যাদি নিজেরাই করেন। তাহাদের বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে বাৎসরিক দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে। পুরোহিত সে পূজা সম্পাদন করিতেন। ব্রহ্মচারীবাবার আদেশ ও উপদেশে স্থির হয়, এবার তাঁহাদের বাড়ীর বার্ষিক দুর্গাপূজা পুরোহিতের দ্বারা না করাইয়া নিজেরাই সম্পাদন করিবেন, ব্রহ্মচারীবাবা পূজার কয়েকদিন পূর্ব্বে শুভ পদার্পণ করিয়া উপস্থিত থাকিবেন। তজ্জন্য মাসাধিককাল পূর্ব্ব হইতে অজপানন্দ ও নকুলবাবু প্রভৃতি পূজাবিধি লিখিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। নেত্রকোণা আশ্রমেও দুর্গাপূজা হইবে। ব্রহ্মচারী-বাবা হেমদা ও পিসিমার উপর আশ্রমের পূজার ভার দিয়া ষষ্ঠীদিন সন্ধ্যায় নকুলবাবুর সঙ্গে নৌকায় হাসামপুরে উপস্থিত

হইলেন। বাড়ীর কর্ত্তা নকুলবাবু স্বয়ং পূজক, অজপানন্দ তন্ত্রধারক, সুরেশদা মায়ের পূজার সাহায্যকারী—বাড়ীর ছেলে মেয়েদের সাহায্যে ও উৎসাহে পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারীবাবার উপস্থিতিতে ১৩৩২ সনের আশ্বিন মাসের শ্রীশ্রীতুর্গা পূজা মহাসমারোহে মহানন্দে সম্পন্ন হইল। হাসামপুরের সরকার মহাশয়গণ প্রচলিত প্রথানুসারে পুরোহিত দিয়া পূজাকার্য্য না করাইয়া নিজেরা পূজা করিয়াছেন—ইহাতে চারিদিকের সমাজে বিপুল সাড়া পড়িল এবং সমালোচনাও আরম্ভ হইল। এইভাবে ব্রহ্মচারীবাবার কঠোর তপস্যা ও আধ্যাত্মিক প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

হাসামপুরের পূজাকার্য্য সমাপনান্তে ব্রহ্মচারীবাবা চিত্রধাম আশ্রমে ফিরিয়া আসেন এবং হেমদা প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন—"এতদিনে হাসামপুরে আমার ধর্ম্মটা পাতিয়া আসিলাম।"

এবার তুর্গাপূজার সময় ব্রহ্মচারীবাবা কাঁওরাইদ নিবাসী মুরারিমোহনদার বাড়ীতে যাইবেন, ইতোপূর্ব্বে এইরূপ কথা হইয়াছিল এবং তথায় তুর্গা মূর্ত্তিও নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা তথায় উপস্থিত না হওয়াতে পূজা হয় নাই। চিত্রধাম-আশ্রমে লক্ষীপূর্ণিমা উৎসব সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার প্রিয় ভক্ত মুরারিমোহনের বাড়ীতে গেলেন। গোবিন্দদা ও কুমারী সুমতিবালা সঙ্গে গিয়াছিলেন, এবং হেমদা পরে তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীতুর্গামূর্ত্তি শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীরূপে পূজিতা হইলেন। এই পূজা

উপলক্ষ্যে উপেন্দ্রচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রমোহন দত্ত, নকুলচন্দ্র সরকার, যামিনীকান্ত করবর্ম্মা এবং প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক দিগেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাওরাইদ মুরারিমোহনের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। মুরারিদার বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে ব্রহ্মচারীবাবা এবং তাঁহার বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শিষ্যগণের উপস্থিতিতে খুব আনন্দোৎসব হয়। "ভারত-সমাজ গঠন প্রতিষ্ঠানের" ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন এখানেই সম্পন্ন হয়।

পূজা ও উৎসব সমাপনান্তে মুরারিমোহনদা ব্রহ্মচারী-বাবার শারীরিক দুর্ব্বলতা দৃষ্টে তাহার বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করায় ব্রহ্মচারীবাবা প্রিয় ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাওরাইদ অবস্থান করেন। এই সময় বনগ্রামের কবিরাজ রামচন্দ্র দে ব্রহ্মচারী বাবার চিকিৎসা করিতেন। ঢাকায় তাহার ঔষধালয় ছিল। ভক্ত কবিরাজ মহাশয় সপ্তাহে একদিন ঢাকা হইতে কাওরাইদ আসিয়া ব্রহ্মচারীবাবাকে দেখিয়া যাইতেন। মুরারিমোহন ও তাহার স্ত্রী কুসুমকুমারীর প্রাণপণ সেবাযত্নে ব্রহ্মচারীবাবা অনেকখানি নিরাময় হইয়াছিলেন। এই সময় মোক্ষদানন্দ প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পর কাশ্মীর হইতে আসিয়া কাওরাইদে ব্রহ্মচারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে ও আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে যোগদান করেন।

১৩৩২ সনের দোল পূর্ণিমার পূর্ব্বেই ব্রহ্মচারীবাবা

কাওরাইদ হইতে নেত্রকোণা চিত্রধাম আশ্রমে উপস্থিত হন। দোলযাত্রা সম্পন্ন করিয়া ভক্তগণকে আহ্বান করতঃ আশ্রম, পত্রিকা ও মাতৃভাণ্ডার পরিচালনার জন্য "ভারত সমাজ-গঠন প্রতিষ্ঠান" নামক সমিতির আহ্বান করিলেন, এবং সমিতির হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করতঃ ব্রহ্মচারী বাবা উপদেষ্টা রহিলেন। সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্ত কর্ম্মিগণ পরমোৎসাহে "মাতৃভাণ্ডার" ও "সোণার-ভারত" নামক মাসিক পত্রিকা পরিচালনা এবং সমাজ সংস্কারের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ১৩৩৩ সনের বৈশাখ মাসে অজপানন্দের সম্পাদনায় "সোণার-ভারত" মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং তখন হইতে প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকে।

ব্রহ্মচারীবাবার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের উপর ছিল মায়াবাদের প্রভাব, এবং গৃহী-শিষ্য ও ভক্তগণের মধ্যে ছিল সামাজিক কুসংস্কারের প্রভাব। পরস্পর এই বিরোধী-ভাব থাকায় গৃহীভক্ত ও সন্ন্যাসীশিষ্যগণের মধ্যে আন্তরিক মিলন বা মতের সমন্বয় এবং কার্য্যে সামঞ্জস্য প্রায়ই রক্ষিত হইত না। এমন কি আশ্রমের নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্ম্মে ও ব্রহ্মচারীবাবার সেবা শুশ্রূষায় ভীষণ অমনোযোগ দেখা দিল। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন—"আমার স্থূল দেহটি তোমাদের একটি সম্পত্তি, ইহাতে হয়ত তোমরা মন দেও না। তোমাদিগকে আমার জানান উচিত যে, শুশ্রূষা ও সেবার অভাবে তোমাদের এই সম্পত্তিটি

নষ্ট হইতে চলিয়াছে।" এই কথার পর অবস্থাপন্ন গৃহী ভক্তদের মধ্যে দুই একজন ব্রহ্মচারী বাবাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া একান্তে সেবা শুশ্রূষা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা আশ্রম ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। সিংরৈল নিবাসী শ্রীযুক্তসুরেন্দ্রমোহন দত্ত আশ্রমে একটী গাভী কিনিয়া দিয়াছিলেন ব্রহ্মচারীবাবার সেবার দুধের জন্য। শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র সরকার প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত বাড়ী হইতে কিছু কিছু চাউল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবাকে ঘিরিয়া নিত্য আশ্রমে এত লোক সমাগম হইত যে, আশ্রমের স্থায়ী কোন আয় বা সাহায্যের ব্যবস্থা না থাকায় দৈনন্দিন সেবা পূজা ও অতিথি অভ্যাগতদের সেবার ব্যবস্থা কোন প্রকারে হইত। ব্রহ্মচারী বাবার নিজের সেবার হয়ত যথেষ্টই ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু আশ্রমের স্থায়ী সেবকগণ এবং অভ্যাগত আগন্তুকদের সেবার ব্যবস্থা না থাকায় তিনি নিজের সেবা শুশ্রূষায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেন, কারণ তিনি নিজের সেবার জন্য কখনও স্বতন্ত্র বা বিশেষ ব্যবস্থা মোটেই পছন্দ করিতেন না। এখন যদিও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন তথাপি আশ্রম-বাসীদের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা না হওয়ায় তিনি নিজের সেবার বিশেষ ব্যবস্থায় মোটেই পরিতৃপ্ত হইলেন না এবং স্বস্তিও বোধ করিলেন না। এই সময়ে আশ্রমের গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তগণের মতান্তর ক্রমে মনান্তরে পরিণত হইয়া আরও গুরুতর রূপ ধারণ করিল। মোক্ষদানন্দ, যোগানন্দ ও ধীরানন্দ

প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ মিলন অসম্ভব দেখিয়া—"ভারত-সমাজ-গঠন প্রতিষ্ঠান" ও "সোণার-ভারত" পত্রিকা পরিচালনা প্রভৃতি আরব্ধ কার্য্যগুলি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীবাবাকে বলিয়া আবার পর্য্যটনে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী বাবা উভয় পক্ষের মিলনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসিগণ একান্ত ঔদ্ধত্য বশতঃ ব্রহ্মচারী বাবার উপদেশের মর্ম্ম এবং তাঁহার দিব্য ভাগবত কার্য্যের মহান লক্ষ্য বুঝিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচারী বাবা অতঃপর নীরব রহিলেন।

সন্ন্যাসিগণের এই প্রকার ঔদ্ধত্য ও কর্ম্মবিমুখতার জন্য আশ্রমে অনেকবার অনেক কাজ আরম্ভ হইয়াও বেশী দিন চলিতে পারে নাই। তাহাদের গুরুবাক্যে নিষ্ঠা না থাকায়—তাহারা কর্ম্মযোগের গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারায়, এবং নিজেদের কর্ম্মবিমুখতা ও অজ্ঞানতার ধারায় চলার মজ্জাগত অভ্যাস ও ঔদ্ধত্য বশতঃ সামান্য বাধা বিঘ্নের উপস্থিতিতেই আরব্ধ কার্য্য পুনঃ পুনঃ নষ্ট হইয়াছে। অসীম স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যশীল ব্রহ্মচারীবাবা বহুবার সন্ন্যাসীদের এই প্রকার বিরুদ্ধভাব সহ্য করিয়াছেন, কখনও কাহাকেও কিছুই বলেন নাই ; মাত্র বলিতেন—'কলির প্রভাব খুবই বেশী।'

পৃথীবীর ক্ষেত্র হয়ত প্রস্তুত হয় নাই। মানুষের আধার-যন্ত্র উপরের চেতনা ও শক্তি গ্রহণ করিয়া পার্থিব বাধা বিঘ্নের মধ্যে ভাগবত কার্য্য সাধন করিতে হয়ত এখনও উন্মুখ নয়। তাই হয়ত মা তাঁহার প্রিয়তম সন্তানকে আহ্বান করিলেন।

এবার ব্রহ্মচারীবাবা আর সহ্য করিলেন না, মা'র কোলে চির-বিশ্রাম লাভের আহ্বান গ্রহণ করিলেন।

১৩৩৩ সনের ঝুলন উৎসবে পুনরায় সমিতিকে ডাকিয়া প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিলেন। তখনও পর্য্যন্ত কাহারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নাই যে, এত শীঘ্র তিনি দেহরক্ষা করিবেন। সমিতির কার্য্য সমাপনান্তে গৃহীভক্তগণ যার যার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্বেই পর্য্যটনে চলিয়া গিয়াছিলেন। অজপানন্দ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, সুমতিবালা প্রভৃতি দুই তিন জন মাত্র আশ্রমে থাকিয়া ভিক্ষাদি, সেবাপূজা, নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম্ম, ব্রহ্মচারীবাবার সেবা শুশ্রূষা, প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকার পরিচালনা ইত্যাদি কার্য্য যথাশক্তি করিতে লাগিলেন।

ভাদ্র মাসের রাধাষ্টমীর প্রায় পনরদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীবাবা আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ী হইতে পঞ্জিকা আনাইয়া একটি দিন দেখিলেন—কিসের দিন তাহা কাহাকেও কিছু বলিলেন না। ক্রমে ২৮শে ভাদ্র মঙ্গলবার, রাধাষ্টমী তিথি আসিল। অপরাহ্নে আশ্রমবাসী যে দুই তিন জন ভক্ত আছেন, তাহারা যে যাহার কাজে গিয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবা আশ্রমের বড় ঘরটিতে শয়ন করিয়া আছেন। দৈবক্রমে ধুলদিয়ার ভক্ত বিষ্ণুরামদা সেদিন আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বাবার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া। বাবা একবারে তাহার দিকে তাকাইলেন। বিষ্ণুরামদা বলিলেন—'বাবা কি কিছু বলিবেন ?' কিন্তু তিনি কোন কথা বলিলেন না, ধীরে ধীরে উঠিয়া

বসিলেন, মাথার বালিশটি দক্ষিণ হইতে নিজ হাতে উত্তর দিকে রাখিয়া পুনরায় আস্তে আস্তে শয়ন করিলেন। মাথায় হাওয়া করিতে ইঙ্গিত করিলে সুমতিবালা ও বিষ্ণুরামদা হাত-পাখা দ্বারা হাওয়া করিতে লাগিলেন।

দিনমানের খরতর রবি সান্ধ্যগগনে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিল—ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে অন্ধকারের আবরণ টানিয়া দিয়া পশ্চিম-গগনে অস্তমিত হইল। বাবা স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন—নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ! তিনবার এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতের এই মহাযোগী মহাধ্যানে মগ্ন হইলেন! নিঃস্পন্দ দেহ, স্তিমিত নয়ন, সৌম্য প্রশান্ত বদন-মণ্ডল সমন্বিত শ্রীঅঙ্গে এক স্বর্গীয় দিব্য জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! মুহূর্ত্তে সে সংবাদ চতুর্দ্দিকে পরিব্যপ্ত হইল, দলে দলে লোক আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিল। দূরবর্ত্তী ভক্তগণেরও অনেকে তার-বার্ত্তায় এই সংবাদ পাইয়া আশ্রমে উপনীত হইলেন,—অশ্রু বিগলিত লোচনে সেই মহাসমাধিমগ্ন শ্রীমূর্ত্তি শেষবারের মত দর্শন করিয়া জীবন কৃতার্থ করিলেন।

"ভারত-সূর্য্যের" অস্তগমনে তাঁহার শত সহস্র ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে সেদিন শোকের যে বিষাদ-করুণ ছায়া নামিয়াছিল—পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌গুরুদেব শ্রীশ্রীভারতব্রহ্মচারীবাবার শাশ্বত দিব্য শক্তিবলে সকলের অন্তর হইতে সে বিষাদ-মলিন ছায়া অপনোদিত হউক্,—আমরা সকলে সেই দিব্য মহান্ শক্তি ও শান্তির আস্বাদ লাভ করিয়া যেন ধন্য হই।

ওঁ শান্তি ওঁ

ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী

পর্য্যটক শ্রীমান্ যোগানন্দের নিকট—হৃষীকেশ।

কল্যাণবরেষু,

যোগদা, (যোগানন্দ) * গতকল্য তোমার চিঠিখানা পাইয়াছি। এখনও আমাকে এখানেই থাকিতে হইতেছে। দেশের নেতৃবর্গ প্রায় ১৩।১৪ জন স্কুলের ছাত্রকে বয়ন কার্য্য শিক্ষার জন্য মতিরাম নাথের নিকট পাঠাইয়াছেন। অন্য জায়গায় সুবিধা না থাকায় তাহারা আশ্রমেই প্রসাদ পাইতেছে। তজ্জন্যই আমাকে এখানে থাকিতে হইতেছে। 'সিদ্ধাশ্রমে' কেদার ও সুশীলকে রাখিয়াছি। শ্রীমান্ যোগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র তথায় লেখাপড়া করিতেছে।

তুমি ৺কাশীধামে যে আদেশ পাইয়াছ, ইহা ৺শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর রূপে বাবারই আদেশ। আর স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ, তাহাও

---

* শ্রীশ্রীব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষার পর তাঁহারই প্রেরণা ও ইঙ্গিতে যোগানন্দ দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে ১৯৩২ সনের ১৭ই আগষ্ট যোগদান করেন। তখন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা যোগদানন্দের নূতন নামকরণ করেন—"যোগানন্দ"।

ঠিক। আমি জানি পূর্ব্ব হইতেই তোমার কাজ ভালই চলিতেছে। সেমতে লিখি, তোমার এই বুঝিতে হইবে—"গন্তব্য স্থলে যাওয়ার সোজা পথই পাইয়াছ, কেন তুমি হতাশ হইয়া পথহারা লোকের মত অশান্তি ভোগ করিতেছ?"—ইহাই আদেশের অর্থ।

আর হৃষীকেশের স্বপ্নাদেশের অর্থ এই—"জ্ঞানরূপ ছেলে তোমার কোলে। তাকে নিয়া যেখানে যাও, তাহার সুখ শান্তি হইবেই, দুঃখ কেবল তোমারই। তাই জানাইয়াছেন যে, জ্ঞানরূপ বালক হইয়া অর্থাৎ কর্ত্তা না সাজিয়া (বালক কোলে না লইয়া) মায়ের কোলে বসিয়া তাঁর ভালবাসা পাইবার জন্য পুন; পুনঃ আবদার কর। মা হয়ত তোমার আবেগ মাখান ডাক শুনিতে ভালবাসিয়া আরও ডাকিবার জন্য নীরব থাকিতে পারেন। এ জন্য অস্থির হইয়া মায়ের কোল হইতে নামিয়া ছুটা ছুটি করিয়া দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ কেন? যে বিবেক লইয়া হতাশ হইতেছ, ইহাই বালক, অর্থাৎ যখন বুঝিবে মায়ের কোলে তুমি, তখনই তুমি বালক বা জ্ঞান স্বরূপ; তবেই তোমার দুঃখ নাই। যদিও দুঃখ তাপ আসে, ইহা তাপসের তাপ, বড়ই মিষ্ট।"

আর তুমি মায়ের কোলে আছ কি না, এমন ভ্রম হইলে বুঝিতে হইবে—যে নির্গুণ পরতত্ত্বে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড লয় পাইতেছে এবং যাহা হইতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইতেছে, ইনিই ব্রহ্মযোনি—আমাদের মা। শুধু আমাদের কেন, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেরই মা। আচ্ছা,

এখন তুমি বুঝিলে ত যে তুমি মায়ের কোলে।

তাই আমার ইচ্ছা সাধারণভাবে মাকে জানিয়া মায়ের কোলে বসিয়া উপাসনারূপ আব্দার করিতে করিতে হ্লাদিনী স্বরূপা শক্তি প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণলীলার অধিকারী হও।

যদি বুঝিতে ভ্রম হয়, তবে স্থানে স্থানে মৎস্বরূপ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের নিকট জানিয়া লইলেও ভাল। যদি একান্তই আসিতে বিলম্ব কর, তবে চিঠি দিও। আর বিবাহের মত কর্ম্মপাশ আমিই ছেদন করিতে পারি। ইতি—

১৩২৮।২১।২ }
গৌরী-আশ্রম। }

আশীর্ব্বাদক—
তোমাদের একটা পাষাণে গড়া লোক।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার দে, উকিল,—নেত্রকোণা।

আমি শীঘ্রই বোধ হয় আশ্রমে ফিরিয়া যাইব। ময়মনসিংহে যে সব ছেলেরা বয়ন শিক্ষা দিবার জন্য গিয়াছে, সেখানে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। শ্রীমান্ সুশীলকেও মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতে হইবে, অর্থাৎ তাহাকে উভয় জায়গায়ই দেখিতে হইবে। তাই লিখি, আপনি শ্রীমৎ যোগেন্দ্র বাবুকে বলিবেন, আমার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটু দৃষ্টি রাখিবেন যে কেমন ভাবে চলিতেছে। আর শুনিলাম দুর্গাপুর কংগ্রেস কমিটিতে কয়জন শিক্ষক

দিতে হইবে। দেওয়াও দরকার। তাহাও লক্ষ্য রাখিবেন। বর্ত্তমান সময়ে আমার মনে হয়, আপনাদের নেত্রকোণায় আরও কয়েকটি তাঁত বসাইয়া কাপড় বয়ন শিক্ষা দিবার জন্য আর অন্ততঃ ৮৷১০টি ছাত্রের খোরাক চালাইবার জন্য চেষ্টা করা খুব উচিত। ইহাতে তাড়াতাড়ি কাজ হইবে। ইহারা শিক্ষা করিয়া অন্যান্য গ্রামে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়াইতে পারিবে। ইহাতে কাপড় খুব বাহির হইবে। আর চড়কা প্রচলনের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। আমার মনে হয়, আপনাদের কংগ্রেস কমিটির নেতৃবর্গ একটু জোর দিলে অতি শীঘ্রই উক্ত সবডিভিসন তাঁত ও চড়কার কাজে ভাসিয়া পড়িবে। মোট কথা তাঁত, চড়কা ও তুলার জন্য অন্ততঃ হাজার তিনেক টাকা হইলেই বিশেষ কাজ হইবে। এই আমার অনুরোধ। যত সত্বর সম্ভব হয়, ভিক্ষাতেই হউক, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াই হউক, বিনামূল্যে চড়কাদি দিবার ইচ্ছা করিয়া কাজে হাত দেওয়া উচিত, তবেই ভাল কাজ চলিবে। আর যাহারা চড়কার দাম দিতে পারিবে তাহারা অবশ্যই দিবে। আর সূতা-কাটা শিক্ষা ঘরে ঘরে যাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে আশা করি যে, অন্ততঃ ৫৷৬ মাসের মধ্যেই বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে। আমি কি করি? এসব বিষয়ে আমি অক্ষম। কারণ আমাদের ভিক্ষা বেশী মিলে না, যাহা হয় তাহা অন্যান্য রকমেই লাগিয়া যায়। আমি আশা করিতেছি যে নেত্রকোণার উকিল-বাবুগণ ইচ্ছা করিলে এক দিনের মধ্যেই ২৷৩ হাজার টাকা

সংগৃহীত হইতে পারে। এই টাউনের মধ্যে এমন কি কেউ নাই যে, হাজার দু'হাজার চড়কা বিতরণ ও তাঁত প্রচলনের জন্য নিজেদের জমাজমি, ঘর-দরজা বিক্রয় বা রেহেন বন্ধক দিয়া পথের ভিখারী সাজিয়া বা বৃক্ষতলবাসী হইয়া হইলেও এমন সময়ে কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া এমন একটা কাজ উদ্ধার করিতে ব্রতী হন? আর কি এই ভাবে থাকিবার সময়? দেশের এত এত প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ, এমন কি যাহারা কোটিপতি তাঁহারও সংসারের আশা পরিত্যাগ করিয়া এসব বিষয় বৈভব দেশ-মাতৃকার পদে অঞ্জলি দিয়া এমন কঠোর কারাদণ্ড বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা কি ইচ্ছা, করিলে রাজসুখ ভোগ করিয়া জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারিতেন না? আর যিনি স্বর্গের ধন, দেবতাদিগেরও শ্রেষ্ঠ, আজ তিনি মানবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্তে অবতরণ করিয়া এ সব বিষয় বৈভব পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া তোমাদের জন্য পথের ভিখারী সাজিয়া, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে আজ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এমন কঠোর কারাদণ্ড বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া শুনিয়াও এতদ্দেশে কি এমন কেহ ভাসিল না, যে তাঁহার গ্রেপ্তারের খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ সর্ব্বস্বান্ত করিয়া হইলেও তাঁহার আদেশ পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে অতি দ্রুতবেগে চলিয়া যায়? আপনারা খুব মনে রাখিবেন তিনি ইচ্ছা করিয়াই ধরা দিয়াছেন। তিনি যদি ধরা না দিতেন, তবে কাহার সাধ্য তাঁহাকে ধরে? ইহা

কেবল জগৎকে জানাইলেন যে, এইরূপ ত্যাগ স্বীকার না করিলে চলিবে না। তাই তিনি আজ বন্দী। অতএব আমার লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, আপনাদিগকে আমি অনুরোধ করি, না হয় আপনারা দুই ভাই নিজেকে ভুলিয়া—বিষয় সম্পত্তি ভুলিয়া মহাত্মার কাজ উদ্ধার করুন।

হাসামপুর
১৩২৮।১২।৫

আঃ
ভারত

গৌরী আশ্রমের সাধকগণের নিকট—

তোমরা এক বেলা প্রসাদ পাইবা এবং মাসের মধ্যে ৪।৫ দিন উপবাস করিতে চেষ্টা করিবা। এমন ভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবা যেন ৫।৭ দিবস উপবাস থাকিয়াও রীতিমত কাজ করিতে পার, তাহা না হইলে কিন্তু চলিবে না। আমার সাধন অবস্থাতেও মাসের মধ্যে ৫।৭ দিন প্রসাদ পাইয়াছি কি না সন্দেহ। মানুষের সংযমই প্রধান ধর্ম্ম। সংযম অভ্যাস না করিতে পারিলে মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। তাই লিখি, সংযমী হইতে চেষ্টা কর। মানুষ সংযমী হইতে পারিলে তাহারই ভিতর দিয়া মা বৃহৎ বৃহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। শ্রীমান্ লক্ষ্মণ চৌদ্দ বৎসর অনিদ্রা, অনশনে থাকিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইন্দ্রজিৎ হেন বীরকে বিনাশ করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজেন্দ্রবৃন্দেরা এত সুখ স্বচ্ছন্দে থাকা

সত্ত্বেও এরূপ কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। আমার কথা রাখ। খুব সংযমের সহিত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত রক্ষা কর—দেখিবে অচিরেই সুখ দুঃখের বাহিরে যাইতে পারিবে। মানুষের ব্রহ্মচর্য্যই মূল। মহাদেব হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন পর শ্রীমান্ কার্ত্তিকের জন্ম হয়। এই ছয় দিনের শিশু হইয়া ত্রিপুরাসুর ইত্যাদি কত মহাবীগণকে নিধন করিয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। আজ কাল এমন লোক অতি বিরল। তাই আজ দেশের এই অবস্থা। দেশের লোকগুলি কেবল ভাত ভাত করিয়া সব তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। সংযমের মধ্যে আহার সংযমই প্রধান। ইহাতে বাহিরে বহু বিষয়ের সংযম আপনা হইতেই হয়। আজকাল দেশের কাজ করিতে হইলে কঠোর সংযমী হইতে হইবে—আবার সত্যযুগ ফিরাইয়া আনিতে হইবে—বলবীর্য্যশালী হইতে হইবে, মনের একাগ্রতা জন্মাইতে হইবে। তাই লিখি, বাহিরের সংযমের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উপাসনা দ্বারা অতি সত্বর কর্ম্মোপযোগী হও।

১৩২৮।১২।৬ } আঃ
হাসামপুর } ভারত

শ্রীমান্ সরলানন্দ, সিদ্ধাশ্রম,—লক্ষ্মীয়া।

শ্রীমান্ শচীন্দ্রের নিকট জানিলাম তোমার শরীর কিছু কাতর, বুকে কফের জোর বেশী। তাই লিখি, একটু নিয়ম মত চলিবা, হাতে পায়ে ঠাণ্ডা কম লাগাইবা, বুকে পুরাতন ঘৃত মালিশ করিবা আর ভস্ত্রিকা করিবা, ইহাতে কিছু উপকার হইবে। এসব আধি ব্যাধি পূর্ব্ব কর্ম্মফলেই হইয়া থাকে। ইহাতে এত অস্থির না হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবা। আর খুব মনের আবেগে বিপদ ভঞ্জন নাম (প্রণব) জপ করিবা। এ সব আপদ বিপদে অধীর হইয়া কোন লাভ নাই, বরং ব্যাঘাতই। আর সর্ব্বদাই মনে রাখিও, কেবল বাড়ী ঘর থাকিলেই যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইয়া থাকে তাহা নহে। যদি তাহাই হইত, তবে বুদ্ধ ইত্যাদি মহাপুরুষগণ রাজত্বাদি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেন না। তাই লিখি, একমাত্র ভগবৎ কৃপা ভিন্ন জীবের আর অন্য উপায় নাই। স্থির ধীর ভাবে উপাসনা করিতে থাক। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব দুষ্কৃতি নষ্ট হইয়া অচিরেই শান্তি লাভ করিতে পারিবা। রোজই নাভিতে ও হৃদয়ে মন স্থির করিতে চেষ্টা করিও, নানা স্থানে ঘুরিতে ফিরিতে ইচ্ছা করিও না, ইহাতে লাভ নাই।

১৩২৮।১৬।৭ } আঃ
গৌরী-আশ্রম। } ভারত

শ্রীমান্ শান্তিদানন্দ, সিদ্ধাশ্রম,—লক্ষ্মীয়া

বর্ত্তমানে আমি নিজে আসিতে পারিতেছি না বিধায় বাহিরের নানা কাজ দেখিবার জন্য অদ্য শ্রীমান্ রাধানাথ ও সুশীলকে পাঠাইলাম। আর শ্রীমান্ কেদার (কুমুদানন্দ) যদি অধঃস্থ (নিম্নশ্রেণীর) ছাত্রদিগকে পড়াশুনা করাইতে অক্ষম হয়, তবেও কাহাকেও যাইতে উপদেশ দিবা না। আমি যে প্রকারেই পারি একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিব। আর শ্রীমান্ যোগেন্দ্রকে জানাইবা যদি একজন পণ্ডিত তাহাকে যোগাড় করিয়া দিতে না পারি, তবে সে যেন আরও মাস দুই মাস এইভাবে থাকে, তবুও তাহার অমঙ্গল হইবে না। বরং সে নিজে বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবে। আর বর্ত্তমান সময়ে এমন কোন টোল বা স্কুল নাই বা থাকিবে না যে, লেখাপড়ার কাজ ভাল চলিতেছে বা চলিবে। আমি পূর্ব্বেও বলিয়া আসিয়াছি। এই দৃষ্টেও তাহার এইভাবে থাকা আমার মতে অতি উত্তম। কথাটা এই যে, হুজুরের মজুরও ভাল, অর্থাৎ জ্ঞানী মূর্খও ভাল—নিরক্ষর কবি রামুও ভাল। সে যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত দুঃখে কষ্টে আমাকে লক্ষ্য করিয়া থাকিতেছে, আমি জানি তাহার কিছুতেই অমঙ্গল হইবে না; কারণ আমি বেশ বুঝিয়া আসিতেছি।

আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই আমার গর্ভধারিণীকে স্বপ্নাদেশ বা দৈববাণী দ্বারা উপদেশ দিয়া ও উপাসনা প্রার্থনাদি করাইয়া আনিয়াছেন যে, তুমি এইভাবে চল আর চন্দ্র রূপের উপাসনা কর—"আমি আসিব"। আমি জন্ম লইয়াছি পরও

গর্ভধারিণীর কার্য্যকলাপ দেখিতে দেখিতে একটু বড় হইলাম। গুরু-কৃপা লাভ করিলাম পর, বাবা শ্রীকৃষ্ণরূপে আমাকে আদেশ ও উপদেশ দিয়া আমাকে একটু জ্ঞান দিলেন এবং মাকে আনিয়া আমাকে মায়ের কোলে দিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং আমাকে জানাইলেন—"আমরা আসিয়াছি জগতের মঙ্গল বিধান করিতে"। আরও বলিলেন—"আমরা অর্থাৎ আমি দেবতাগণ নিয়া ইউরোপে মহাসমরে ব্রতী হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিব। তৎপর ভারত স্বাধীন করিয়া—সত্যধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া দেবতা মানবের সম্মিলনে অপূর্ব্ব লীলা করিব।" তারপর আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া নানা দেবতার আবির্ভাব, নানা ক্ষেত্রপীঠ হইতে শক্তি সহযোগে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বামন রামাদি অবতার ও বুদ্ধ শঙ্করাদি, এমন কি পূর্ব্ববঙ্গের লোকনাথ, রামকৃষ্ণাদি মহাপুরুষ নিয়া মা জগতের মঙ্গল বিধানের জন্য ব্রতী হইলেন এবং ইউরোপের যুদ্ধ সমাধা করিয়া এই পুণ্য ক্ষেত্র ভারত ভূমে আবির্ভূতা হইয়া বদরিকাশ্রমের কর্ত্তাকে সহায় করিয়া আজকাল যে খেলা আরম্ভ করিয়াছেন তাহা ত বর্ত্তমানেই। আমার কথা এই যে শ্রীমান্ যোগেন্দ্রকে আশ্রমে আনিয়াছি, তাহার পরিণাম খারাপ হইবে এই বলিয়া শ্রীমান্ যোগদা (যোগানন্দ) বা যোগেন্দ্র পরিতাপ না করুক। বর্ত্তমান অবস্থা অতি দুষ্কর, অন্য কোন স্থানে কোন সুবিধা হইবে না এবং বাড়ীতে থাকিলেও ভাল হইবে না।

আর এক কথা, শ্রীমান্ শচীন্দ্র যাহা বলিয়াছে এবং

তোমরা যাহা মনস্থ করিয়াছ, তোমরা সন্ন্যাসী—ধর্ম্ম থাকিল। ভিক্ষা করিবে যাচ্ঞা করিবে না। তোমাদের এই পরামর্শের মধ্যে তোমাদের মনোমধ্যে ভবিষ্যৎ যাচ্ঞা করিলাম, এইভাব যদি জাগিয়া উঠে, তবে তোমাদের আত্মার বল কমিয়া যাইবে। আর তাহারও যদি সন্ন্যাসীদের উপকার করিলাম, এই ভাব জাগিয়া উঠে তবে তাহার বিকার জন্মিবে। এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া কাজ করিতে হইবে। বিষয়টা যে সত্য তাহা আমার এক মুখে কেন, অনন্ত মুখে প্রকাশ করিলেও ইহা অব্যক্ত থাকিবে। এই সুবিধাটুকু করিবার জন্যই আমি ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে এই সুবিধাই নাই। আর বিশেষ কি লিখিব। মা সব করিতেছেন ও করিবেন, তোমরা সবেগে আপন আপন কাজ করিতে দুর্ব্বলতা আনিবা না।

জগৎটা মায়ের প্রতিমা। প্রাপ্ত বস্তু মায়ের দেওয়া। সন্তোষ মায়ের কৃপা, অসন্তোষ অকৃপা। শান্তি মায়ের অভয় কোল—অশান্তি মা'র অসির তাড়না। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা মায়ের কোলে থাকিয়া মায়ের বৈভবরূপ স্তন পান করিয়া আনন্দ-স্বরূপ হও।

১৩২৮।২৮।৮ } আঃ
গৌরী-আশ্রম } ভারত

শ্রীযুক্তঅক্ষয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য,—লক্ষ্মীপুর।

মহাত্মন্!

আপনার রোগ সম্বন্ধে মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিবার কথা বলিয়াছিলেন। মা বলিয়াছেন যে ইহা ভবরোগ, শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলাম। তবে দুঃখের বিষয় এই, আপনারা সিদ্ধ-মহাপুরুষের বংশধর, এই রোগ না সারিয়া যে সাংসারিক কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত থাকিতেছেন, ইহা জগতের অশিক্ষারই কারণ।

পূর্ব্বকালে নিয়ম ছিল যে প্রথমে ঈশ্বর লাভ বা চিত্তশুদ্ধি করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে। এইজন্য উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করার বিধি। শাস্ত্রে আছে, ক্রমে বার বৎসর অটুট ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিলে মেধা নামক নাড়ী জন্মে। ইহার প্রভাবে সাধক শম-দমাদি গুণ সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী হন। পরে বেদান্ত বা গুরুবাক্যে অথবা নিজের অনুভূতিতে পরোক্ষজ্ঞান জন্মিলে ঈশ্বর লাভের অধিকার জন্মে। শম-দমাদি গুণযুক্ত না হইলে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না। আগে ঈশ্বর লাভ বা জ্ঞান লাভ করিয়া পরে ঈশ্বরেচ্ছায় গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে, কিম্বা সমাজ পরিচালনা (সমাজের নেতৃত্ব) করিবে।

শাস্ত্রে ইহাও আছে যে, ঈশ্বর লাভের পূর্ব্বেই যদি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করা যায়, তবে একটি দুইটি সন্তান হইলে পর পুনরায় বানপ্রস্থ আশ্রমের ভিতর দিয়া সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বর লাভ করিবে, ইহা কিন্তু গৌণ বিধি। মানুষের প্রধান

উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। ঈশ্বর লাভ না হইলে নর-লীলার অধিকারী হওয়া যায় না। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিতেন বলিয়াই সমাজ উন্নত হইত। এমন কি রাজেন্দ্রগণের মধ্যেও মহারাজ জনক, অম্বরীষ, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বর লাভের পর রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কথা এই যে, সংসারের বিষয় বিভীষিকা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের দর্শন-বাক্য পাওয়ার জন্য বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। জ্ঞাত কারণ লিখিলাম। ইতি—

১৩২৮।১১।৭ }
বুধপাশা } ভারত

শ্রীযুক্তমহিমচন্দ্র রায়, এম, এ, বি, এল , উকিল, ময়মনসিংহ
(তালজাঙ্গা)

মহাত্মন্!

আমি আশ্রমে আসিয়াছি পর আপনার জেল হইতে ফিরিয়া আসার কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আজকাল দেশের যেরূপ অবস্থা, এ অঞ্চলের নেতৃবর্গের মধ্যে প্রায়কে আবদ্ধ করিয়াছে, বিশেষতঃ তন্মধ্যে আমরা আপনাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি। আপনি যদি পূর্ব্বেই এভাবে আবদ্ধ থাকেন তবে এ অঞ্চলের কাজ ভাল চলিবে না, তাই ভগবৎ ইচ্ছায় আপনি ফেরৎ হইয়াছেন। মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে

না পারিয়া লোকে, অর্থাৎ একে অন্যকে নানা কথা বলিয়া থাকে। এমন কি ভগবানকেও দোষী করিয়া থাকে। তাই লিখি সময় অতি নিকট, এই বারেই আমাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে। আর গৌণ করিবেন না, এখন আবার কাজে অগ্রসর হইলে আপনার দ্বারা খুব কাজ হইবে। এমন কি পূর্ব্বের চেয়েও অনেক শক্তি হইবে। কারণ বর্ত্তমানে মহাশয়ের মত নেতা এ অঞ্চলে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার কথায় কারো কারো বিশ্বাস নাও হইতে পারে, কিন্তু আমি যাহা জানি বা বুঝিয়াছি, আমি নিশ্চয় করিয়াই বলিতেছি। মা'র আদেশ—এবার কলিকাতা ইত্যাদি স্থানে যে খেলা চলিয়াছে, এই আন্দোলন আর না কমিয়া আরও ভীষণ আকার ধারণ করিবে এবং ইহার ভিতরেই স্বরাজ লাভ হইবে। আপনি অতি শীঘ্র দেশের ছেলেদের পশ্চাৎ রক্ষক স্বরূপ হইয়া দাঁড়ান, নচেৎ মায়ের কাজে আংশিক রকমের হইলেও সাময়িক অঙ্গ ভঙ্গ হইবে। আমি যে আপনাদিগকে উপদেশ দিতেছি এমন আমার ভাব নয়, আপনি যে আমার কথার অপেক্ষা করিতেছেন এমনও নয়। তবে আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপনার কথা অম্লান চিত্তে লোকে গ্রহণ করিতেছে এবং করিবে। তাই আমার মনের একটি দুইটি কথা জানাইবার ইচ্ছা হইতেছে। তাই অতি আপন জ্ঞানে প্রকাশ করিতে চাহিলাম। আপনি আপন ভাবে গ্রহণ করিবেন এই আমার ধারণা।

আমার সিদ্ধি লাভের পর—মা আমাকে কৃপা করিয়াছেন পরই বলিয়াছেন—"আমি ইউরোপের শক্তি হ্রাস করিবার

জন্য মহাসমরের সংঘটন করিব; পরে ভারত স্বাধীন করিয়া পৃথিবীতে সত্য-ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া ভারতে দেবতা মানবে অপূর্ব্ব লীলা করিব।" তদবধি আমি এই অপেক্ষায় বসিয়া আছি এবং দেখিয়া আসিতেছি। আর সব দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া শুনিয়াও স্থির থাকিতেছি। কি করি, এসব আমার কাজ নয়। আমি সন্ন্যাসী, আমি ছোট হইতেই এসব সাংসারিক বা রাজনৈতিক কোন কাজই করি নাই। তাই মা আমাকে এসব বড় বড় কাজে অবোধ সন্তান বিধায় নেন না। এসব আপনাদের কাজ, আপনারাই করিবেন। আমি জগতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ দেখিয়া যে কবে এই আনন্দ-সাগরে ভাসিব, তাই আমার উদ্দীপন। আমার দ্বারা কোন কাজ হবে যে এমন বুঝিতেছি না। এমন কি এজন্য মার নিকট প্রার্থনা করিবারও নাই। আমি জানি বর্ত্তমানে মা সমুদয় দেব দেবী সমভিব্যাহারে বিষ্ণু-শক্তি সহায় করিয়া ভারত উদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি করিতেছেন ও করিবেন। মহাত্মা গান্ধীই বিষ্ণুস্বরূপ; তাঁহাতেই বিষ্ণুর আবির্ভাব। তাই লিখি, আর সময় নাই। তাড়াতাড়ি কাজে হাত দেন মনে প্রাণে, এই আমার মনের কথা। লিখিতে লিখিতে মনের আবেগে কত কথাই লিখিয়া ফেলিলাম। আমি কিন্তু মূর্খ, এমন কি ছোট বেলায় কোন স্কুলেও লেখাপড়া করিয়া কোনও জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই।

১৩২৮।১৫।৭ গৌরী আশ্রম	}	আঃ ভারত

শ্রীমান্ সুশীলানন্দ, কংগ্রেস কমিটি, নেত্রকোণা।

কল্যাণবরেষু,

জানিবা মায়ের ইচ্ছায়ই তোমরা সেখানে বাস করিতেছ। মনোযোগের সহিত কাজকর্ম্ম করিও। স্মরণ রাখিও, তোমরা সন্ন্যাসী। ঠাকুর সেবার জন্য বরাবর কংগ্রেস কমিটির অপেক্ষায় থাকা অবিধি হইবে। সেবার জন্য এক হইতে পাঁচ ঘর পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়া লইও, আর কেহ ভোগের জন্য কিছু দিলে গ্রহণ করিও।

শ্রীমৎ বিশ্বামিত্র ঋষি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য পালন করিয়াছিলেন, কেবল বৃক্ষতল পতিত ফল সেবন করিয়া। আর তোমরা যদি নিজেদের দেহরক্ষার জন্য একজনের অপেক্ষায় থাক, তবে ইহা অধর্ম্ম।

কংগ্রেস কমিটির দুই একটি ছেলের সাহায্য কর বলিয়া মনে অহংকার আনিও না। একমুষ্টি ধূলা দ্বারা সাগর বন্ধন দূরের কথা, সামান্য গোষ্পদের জলও রক্ষা করা যায় না।

শ্রীমান্ অধীরকে পাঠাইয়া টাউনে সূতা-কাটা শিক্ষা দেওয়াইও।

শ্রীমৎ নগেন্দ্রবাবুর চিঠিতে জানিতে পারিলাম যে, সেখানে স্থান পাইলে টোল ও বয়ন শিক্ষার জন্য আশ্রমের মত করিবার অনেকের মত আছে। এ সম্বন্ধে আমি কি লিখিব, শুভ ইচ্ছা পূরণার্থ যাহা করিতে হয় করিও। ইতি—

১৩২৮।৬।১০ } আঃ
গৌরী-আশ্রম } ভারত

শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র রায়,—নেত্রকোণা।

তোমার পত্র পাইয়া শোক-দুঃখের সমাবেশে পড়িয়াছি। মনে হয় যেন প্রহ্লাদের কাল। হিরণ্যকশিপুর নির্য্যাতন। এইরূপ মন্বন্তর উপস্থিত অর্থাৎ যুগ পরিবর্ত্তন সময়ে হইয়া থাকে। ইহা কেবল ভক্তের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির কারণ। তুমি বোধ হয় কিছু ভয় পাইতেছ। কিন্তু এইবার কেবল ইহা নয়। এই ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য এবার দেশের বহু লোককে কত কামান গোলাও সহ্য করিতে হইবে। তোমার অভিভাবক তোমাকে ধর্ম্ম করিতে দিতেছে না, আবার ইহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া কত অসৎ কার্য্যও করিতেছে। ইহা কাহার প্রভাব? কেবল রাজ আইনের প্রভাব। কারণ উচিত বলিলে আবার রাজ আইনে দণ্ডিত হইতে হয়। এই প্রকার সময় সময় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন। এইরূপ তোমাদেরও কত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। কারণ বর্ত্তমানে এই যে রাজনৈতিক আলোচনা চলিতেছে, ইহাতে কত যে নির্য্যাতন সহিতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে আমি বলি মন শক্ত কর, দেশের দিকে লক্ষ্য কর। এসব কলির প্রভাব। এই রাজশক্তিকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটাইতেছে। কোমর শক্ত করিয়া বাঁধ এবং দেশের কাজে লাগিয়া যাও। তোমাদের অভিভাবক দেশের নেতৃবর্গ, তাঁহাদের উপদেশ বা আদেশ পালন কর। তবেই দেখিবে কলির সকল রকমের প্রভাব নষ্ট হইয়া অচিরেই মায়ের শান্তি-ধারায় জগৎকে প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এইসব কেবল

মনের বলের উপরেই নির্ভর করে। জ্ঞাত কারণ লিখিলাম।

১৩২৮।২১।১০ আঃ
গৌরী-আশ্রম ভারত

শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র শীল, কংগ্রেস-কমিটি, নেত্রকোণা

কল্যাণবরেষু,

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনের মধ্যে সংযমই প্রধান তপস্যা, ইহার মধ্যে আহার সংযমই মূল। আমার সাধনাবস্থায় মাসের মধ্যে ৫।৭ দিন প্রসাদ পাইয়াছি কি না সন্দেহ।

আহার সংযমের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও সংযম হইতে থাকে। (আহার টুটিলে টুটে ইন্দ্রিয় বিক্রম)। সংযম অভ্যাস না করিলে মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। সংযমী ব্যক্তির ভিতর দিয়াই মা বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

শ্রীমৎ লক্ষ্মণ চৌদ্দ বৎসর অনাহারে ও অনিদ্রায় থাকিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইন্দ্রজিৎ হেন বীরকে বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাদেবের হাজার বৎসর তপস্যার পর শ্রীমান্ কার্ত্তিকের জন্ম। এই ছয় দিনের শিশু ত্রিপুরাসুর ইত্যাদি কত মহাবীরগণকে নিধন করিয়া জগতে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালীন রাজেন্দ্রগণ এত সুখ স্বচ্ছন্দে থাকা সত্ত্বেও এইরূপ কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতেন। আর আজকাল দেশের লোকগুলি ভাত ভাত করিয়া নানা ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া নিজ তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। এমন কি পরের চিন্তা দূরে থাকুক, আত্ম-চিন্তা বা ঈশ্বর-চিন্তা করিবারও সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

অতএব তোমরাও একবেলা প্রসাদ পাইবা এবং মাসের মধ্যে চার পাঁচ দিন উপবাসী থাকিতে অভ্যাস করিবা। আর ধ্যান ধারণা জপ ও প্রাণায়ামাদি করিতে ভুলিও না।

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতই মানব জীবনের ভিত্তি। ইহা গৃহী ও উদাসী সকলেরই দরকার। আমি দেখিতেছি যে কেবল ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই দেশের লোকগুলি নানা আধি ব্যাধিতে জর্জ্জড়িত হইতেছে। পুরুষদের প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, কফীয় রোগ, বাতরোগ, উদরাময় এবং মেয়েদিগের মধ্যেও উৎকট রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, বাধক, সুতিকা, মৃতবৎসা (টাক্‌রী পাওয়া) ইত্যাদি নানা ব্যাধি প্রায়ই দৃষ্ট হয়। সন্তান সন্ততিগুলিও জীর্ণকায় অল্পায়ু হইয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। আমার বাঞ্ছা যে, তোমরা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে দীর্ঘায়ু ও সুস্থকায় হইয়া জগতে বিচরণ কর। ইতি—

১৩২৮।৬।১২
হাসামপুর

আঃ
ভারত

শ্রীমান্ সুশীলানন্দ,—নেত্রকোণা।

আমি সোমবার দিবস আশ্রমে পৌঁছিয়াছি। তোমার দুর্গাপুর এতদিন থাকায় নেত্রকোণার কাজের বিশেষ শৈথিল্য অনুভব করিতেছি। কারণ ছেলেরা তত আটা-পট্টি ভাবে কাজ করিতে, মন তেমন ভাবে চালনা করিতে চাহে না। অশ্বিনীও এসব বিষয় জানে না। যোগেশও ছেলে মানুষ। তাই লিখি, কেবল কাপড় বয়ন শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। আজ কাল দেশের অধিকাংশ ছেলেই চঞ্চল, মনের স্থিরতা নাই। 'নাই' বলিলে কিন্তু বুঝিতে চাহিবে না। ইহাদিগকে বুঝাইতে হইবে—স্থিরতা সাধন করিবার জন্য। মানব জন্ম ধারণ করিলেই কেবল মানুষ হয় না। বরং আত্ম-জ্ঞান হারাইয়া দেহাভিমানী হয়; এমন কি ভগবানের প্রেরিত অবতারাদিও জন্ম গ্রহণ মাত্রই নিজেকে ভুলিয়া যান। তবে সাধারণ মানুষ হইতে এই মাত্র প্রভেদ থাকে যে, বিবেক বৈরাগ্য অতি অল্প সময় মধ্যে জাগিয়া উঠে। যেমন শ্রীমৎ রামচন্দ্র পনের ষোল বৎসর বয়ক্রমেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইতে পারিয়াছিলেন, এবং ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠ দেবের নিকট আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ক্রমে অলঙ্ঘ্য সাগর বন্ধন করতঃ ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণাদি রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়াই পরাধীন ভারতকে পুনরুদ্ধার করিয়া স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই আত্মজ্ঞান লাভ, ঈশ্বর লাভ, সচ্চিদানন্দ লাভ এক কথা। এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় ব্রহ্মচর্য্য সাধনে। এই যে লোকে বলে,

হরিনামে চতুর্ব্বগের ফল ফলে। চতুর্ব্বর্গ অর্থে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ইহা আর কিছুই না, মানবের স্থৈর্য্যই ধর্ম্ম, ধৈর্য্যই অর্থ, ক্ষমাই কাম, সন্তোষই মোক্ষ লাভ বা মুক্তি লাভ জানিবা। নচেৎ জগতে এমন আর কিছুই নাই যে, ইহা পাইলে মানুষ চিরসুখী হইতে পারে। অতএব লিখি, সকলকেই বলিবা, সর্ব্বদাই যেন স্মরণ রাখে, কর্ম্মের ভিতর দিয়া এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারে।

আর এক কথা, যতদিন যাবৎ কাজ চলিতেছে, ইহার মধ্যে কে কতদিনের মধ্যে কত টাকার সূতার কাপড় প্রস্তুত করিয়াছে, কত লাভ করিয়াছে তাহার তালিকা অতি সত্বর ডাক যোগে পাঠাইয়া দিবা। আর বৈশাখ মাসের মধ্যে অন্ততঃ ১০টি ছাত্র তৈয়ার করিতে হইবে, যেন ১০টি থানার অধীনে ১০টি শিক্ষক দিতে পারা যায়। শ্রীমান্ নগেন্দ্র বাবুকে জানাইবা, যাহাতে অতি সত্বর প্রত্যেক থানার এলাকায় বয়ন প্রচার হয়।

আর কংগ্রেসের সঙ্গে আশ্রমের, অর্থাৎ যখন যে কারণে যাহা লাগে তাহার, এমন কি কংগ্রেস হইতে যাহা দেওয়া হইতেছে, তাহার জমা খরচ করিবা। এসব ভার অশ্বিনীর ঘাড়ে চাপাইবা। আর কোন্ কারিকর দ্বারা কত আয় হইতেছে, মাসান্তে আমাকে নিকাশ বুঝাইতে হইবে। সকলকে মনে রাখিতে হইবে যেন এক কারিকরের নীচে ১০ মিনিটের জন্যও অন্য করিকর না খাটে। অর্থাৎ যে সব কাজ ছাত্রদের দ্বারা চলিবে, তাহা যেন তাহারা না করে। এই নিয়মে কাজ

ভাল চলিবে ও তাড়াতাড়ি শিক্ষা হইবে। আর এমন জোরে কাজ করিবা যে, এক বৎসরের মধ্যে উক্ত সাব্‌ডিভিসনের লোক কাপাড়র জন্য অন্য সাব্‌ডিভিসনের এলাকায় না যায়। খরচের জন্য কোনও চিন্তা করিও না। তোমরা কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা যাহা করিতে পার কর, না হয় আরও ২।১টি সংসার ধ্বংস করিয়া হইলেও খরচ চালাইব। ঘন ঘন চিঠি পত্রাদি দ্বারা যে যেখানে আছে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। নগেন্দ্র বাবুকে বলিবা মাটিয়া-তাঁত তৈয়ার তাড়াতাড়ি যেন করাইবার চেষ্টা করেন। আর বিশেষ কি লিখিব। সকলকেই জানাইবা আমার সন্ন্যাসীত্ব তাহাদের উপর নির্ভর করে। যদিও তাহারা আমার সঙ্গে বেশী দিন সঙ্গ করে নাই, তবু যেন অভ্যাস-যোগ অবলম্বনে বিচার দ্বারা চলিয়া যায়।

তোমাদের খরচ রোজ কত লাগে, হিসাব আমাকে দিতে হইবে। টুপি ইত্যাদির দেনা পাওনা পরিষ্কার করিয়া আমাকে জানাইবা। যোগেশকে জানাইবা দুর্গাকে ২০৲ দিয়াছে।

১৩২৮।২১।১২ ⎫ আঃ
গৌরী-আশ্রম ⎭ ভারত

শ্রীমান্ রাজেন্দ্রচন্দ্র শীল,—নেত্রকোণা।

তোমার পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আমার বিশ্বাস স্থানীয় লোকের অমত প্রকাশের কারণ, উপরের পীড়ন ভয়। আর কংগ্রেস কমিটির উপরও একান্ত কোপ-দৃষ্টি থাকা বশতঃ লোকে মাথা উঠায়না, এবং কমিটিও বিশেষ কাজ করিয়া লোককে উৎসাহিত করিতে পারিতেছেন না। তাই লিখি, উক্ত কংগ্রেসের কর্ম্মীগণকে বলিবা বর্ত্তমান সময়ে এই ভাবে কাজ চলিবে না, এবং কোন কালে চলেও নাই।

যিনি কর্ম্মী—যিনি সৎ, অর্থাৎ যিনি যে বিষয়ের সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই সত্য অন্যকে বুঝাইতে হইলে নিজেদের অন্য কর্ম্মকে গৌণ মনে করিয়া—ইহাই মুখ্য মনে করিয়া, ইহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া, আপন কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ নিজে করিয়া এমন কি যে পর্য্যন্ত ইহার উপকারিতা লোকে না বুঝে, সে পর্য্যন্ত নিজেদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, কাজ না হইলেও যে পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ আছে, তাহার জন্য খাটিতেই হইবে। তবুও যদি সফল না হয়, দেহ শেষ হইয়া যায়, তবেও জানিবা তাহার এই সত্য পথের অনুগামী পুরুষ দুই পুরুষ পরে হইলেও হইবে। ইহা ঈশ্বরেরই বিধান। ইহাকেই সত্য দ্রষ্টা, কর্ম্মী, ত্যাগী, পরোপকারী, মহৎ বা মহীয়ান্ বলে। যেমন সত্য বুঝাইবার জন্য যীশুখৃষ্ট নিজের দেহকে পাষণ্ডের হাতে বিনাশ করিতে দিয়াও জগতের মঙ্গল কামনা করিয়া ইহাদের মঙ্গলের জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে অম্লান চিত্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে

তাঁহার ধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া কত কোটি কোটি লোক তাঁহার সত্য পথের অনুগামী হইয়াছে ও হইতেছে। তাই লিখি, উক্ত কর্ম্মীদের মধ্যে যদি কেহ পারেন যে অন্ততঃ ১০টী লোকের খোরাক বাবত দুই শত আড়াই শত টাকা এবং তাঁত চড়কার জন্য শত পাঁচেক টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন, তাহা যদি হয় তবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। আর তাহা করিতে না পারিলে কিন্তু সহজে পারিবেন না। আমি ৪।৫ দিনের মধ্যে হাসামপুর যাইব। পত্রপাঠ গ্রামের অবস্থা সহ তাহাদের মত আমাকে জানাইবা।

১৩২৯।১৩।১ } আঃ
গৌরী-আশ্রম } ভারত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দে, উকিল,—নেত্রকোণা।

আপনার পত্র পাইয়া খুব সন্তোষ লাভ করিলাম। শ্রীমান্ সুশীলের পত্রে জানিতে পারিলাম, আপনাদের কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মজুমদার নাকি উক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আবার তাঁহার পূর্ব্ব কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজ কাল এমন বিষম সমস্যার সময়, ইহার মধ্যে যদি তাহাদের মত লোক পশ্চাৎপদ হন তবে বড়ই ক্ষতি। কারণ যাহারা উপরস্থ কর্ম্মচারী তাহাদিগকে দেখিয়া শত শত লোক উক্ত

কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ইহাদিগকে এখন বিপদ-সাগরে ফেলিয়া কেবল নিজেদের অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা। নচেৎ কোন লাভের আশায় কাজ করা হইয়াছিল, এখন লাভ নাই বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া। আমি কিন্তু এসব লিখিতে পারি না, কারণ আমি সাধারণ লোক। আমার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, অর্থ বিত্ত কিছুই নাই ; কিন্তু মনে কষ্ট হইলে বিদ্যা বুদ্ধির অপেক্ষা করে না, মনে যাহা আসে বলিয়া ফেলে। আমার কথায় যেন কেহ বিরক্তি প্রকাশ না করেন এই জন্য আমার শত অনুরোধ। তবে কথাটা এই যে যাহাই করুন না কেন, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে খুব ভাবিয়া করিতে হয়। আমি কিন্তু উপদেশ দিতেছি এমন কেহ বুঝিবেন না, তাহা হইলে আমি বড়ই দুঃখিত হইব। আমি আত্মীয় জ্ঞানে মনের কথা জানাইতেছি। আমি সন্ন্যাসী, আমার ভোগ বিলাস, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ এই স্বরাজের জন্য বা স্বাধীনতার জন্য কোন ঠেকা নাই, কারণ আমি সর্ব্বদাই স্বাধীন—কেন না আমি কাহারো অধিকারে থাকিনা। যেমন এ জগতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি, তেমন ইচ্ছা করিয়া যাইতে পারিব। দেহের সুখ দুঃখে আমাকে আটকাইতে পারিবেনা। তবে যে এমন ভাবে চলিতেছি, ইহার কারণ কেবল পল্লীগ্রামে থাকিয়া সকলের সুখ দুঃখে তেমন না হইয়া পারা যায় না। গত পৌষের পূর্ব্ব পৌষে দেখিলাম, আপনাদের নেত্রকোণার কতকগুলি ছেলে মহাত্মার আদেশ বা উপদেশে বস্ত্র সমস্যা দূরীকরণার্থে খুব

উৎসাহিত হইয়াছে, এবং কেহ কেহ আমার নিকট আসিয়াছিল। তাহাদের কথায় আমি ইহা সঙ্গত মনে করিয়া হস্তক্ষেপ করিলাম, স্বরাজ-টরাজ বুঝিতে ইচ্ছাও করিলাম না। এখনও ইহা আমার মনে নাই। ক্রমে ক্রমে দেখিয়া আসিতেছি, শ্রীযুক্তরমেশবাবু উকিল, তিনিও দেশের উপকারার্থ গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোককে উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন, এবং এইভাবে অনেক উকিলবাবু বেগবতী নদীসম কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইয়া দেশ মাতাইয়া ফেলিয়াছেন। লোকগুলি তাহাদের কথায় এমন রাজদ্রোহের কাজে হাত দিয়া বসিয়াছে। এই দেখিলাম একদিন। পরে তাহারা কেহ কেহ আবার ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কাজে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের লোকদিগকে হাসি-কান্নায় ভাসাইতেছেন। বহুলোক বিপদগ্রস্থ হইয়াছে। কেহ বা হাসিতেছে আর বলিয়া আসিতেছে যে, তিনিরাই যখন এমন ভাবে উৎসাহিত করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ হইলেন, তবে আর কিসে কি ইহবে? আবার দেখিয়া শুনিয়া আসিতেছি, সকলেই নাকি সভা সমিতি করিয়া একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। এইসব দেখিয়া শুনিয়া আমি মনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সুহৃদ্ জানিয়া আর কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? কে আমার কথার সদুত্তর দিয়া বাধিত করিবেন? আর কে-ই বা আমার কথার মর্ম্ম বুঝিয়া আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাকে আশ্বস্ত করিবেন? যদি কেহ থাকেন তবে আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী হইব। আমি দেখিতেছি এইবার দেশের দুর্ঘটনা; এইভাবে শিথিল হইয়া

থাকিলে কাহারও অব্যাহতি নাই। কারণ বাঘ যদি ক্রোধান্বিত হয়, তবে হন্তাকারীকেও মারে, আর তামেশগিরকেও মারে। তাই আবার লিখি, পূর্ব্বেই বুঝা উচিত ছিল যে, এমন লণ্ড-ভণ্ড তপস্বীর কথায় (মহাত্মার অর্থাৎ যাহার কাণ্ডজ্ঞান নাই, কোটি কোটি টাকার এমন বিপুল সম্পত্তির দিকে যাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই), এমন লোককে যখন আদর্শ করিয়া কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে, তখনই বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করা উচিত ছিল। তাই লিখি, যাহারা ধরিয়াছেন আর ছাড়িবেন না। এবং আরও সাথী করিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হউন, এই আমার শেষ কথা। আর শুনিলাম, আপনার ভ্রাতা হাইকোর্টের উকিল। তাহাকে আমি দেখি নাই, তবে শুনিয়া মনে হইতেছে তাহার কাছে কিছু বলিতে। সে যাহা হউক, ৪।৫ দিনের মধ্যে হাসামপুর যাইব। তথায় যাইয়া আপনাদের নিকট কতকগুলি বিষয় জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

১৩২৯।১৫।১ }
গৌরী-আশ্রম। }

আঃ
ভারত

সিদ্ধাশ্রমের ব্রতাচারী সন্ন্যাসীগণের নিকট—

নিরাপদে দীর্ঘজীবেষু,

অদ্য তোমাদের একখানা চিঠি পাইলাম। এই যে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য নিয়া বিচার, "আমি সেই" আর "আমি তাঁহার," ইহাতে সাধক অহং-তত্ত্বে থাকিয়া বুঝিবে যে "আমি অহং-তত্ত্ব না, আমি সেই পরতত্ত্ব অথবা আমি সেই পরতত্ত্বের।" ইহাতে উভয় বাক্যেরই এক সিদ্ধান্ত লক্ষিত হয়। কারণ আমি তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া যেমন তাঁহার বলিতেছি, তদ্রূপ পৃথকত্ব হেতুই "আমি সেই" বলিতেছি। "আমি তাঁহার" বলিতে যেমন স্বগত ভেদ দৃষ্ট হয়, "আমি সেই" অর্থেও আমি পৃথক থাকার দরুণ স্বগত ভেদ দৃষ্ট হয়। অতএব উভয় প্রকারেই আমি তিনি থাকায় অপূর্ণত্ব-দোষ হেতু দ্বৈতভাবই প্রতিপন্ন হয়। অদ্বৈতভাব মহত্তত্ত্বাবস্থায়, এই অবস্থায় 'আমি তিনি' থাকে না, কেবল অচিন্ত্য অব্যক্ত মহাভাব মাত্র থাকে। ইহাকে সুধিগণ শুদ্ধ সত্ত্ব ভাব বলেন, তৎপরাবস্থায় ত কিছুই থাকে না।

সাধক অহং-তত্ত্বে থাকিয়া "আমি সেই" বা "আমি তাঁহার" যে যেভাবেই ভাবুক না কেন, ঐকান্তিক চিত্তে একজ্ঞানে ভাবিতে ভাবিতে যে অদ্বৈতাবস্থা আসে, তাহা অচিন্ত্য, অবিচার্য্য। তবে একান্ত অবিবেকীর পক্ষে ভ্রম-প্রমাদ উভয় প্রকারেই থাকিতে পারে। কাহারও বা রজ্জুতে সর্প ভ্রম, কাহারও বা সর্পেতে রজ্জু ভ্রম। ইহাদের সঙ্গে কোন কথাই নাই।

"আমি সেই" এই বাক্যেও ভ্রম জন্মিতে পারে, "আমি তাঁহার" এই বাক্যেও ভ্রম জন্মিতে পারে। আর যিনি ঠিক ঠিক ভাবে একত্বে পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে মতভেদ হইবে না।

যাঁহারা ঠিক ঠিক একত্বে না পৌঁছিয়া পথে আছেন, তাঁহারা যে যেভাবেই শাস্ত্র বাক্য অবলম্বন করিয়াছেন, অনন্য-মনা হইয়া একান্তচিত্তে তাঁহাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছা উচিত্ ; পরে অন্যকে জানা কথা বলিতে সহজ হইবে। নচেৎ শুনা কথা নিয়া গোলমালে শক্তি ক্ষয় জন্য পাছাইয়া পড়ার খুব আশঙ্কা থাকে। জ্ঞাত কারণ লিখিলাম। ইতি।

১৩২৯।৮।২ } আঃ
কালিয়ারা } ভারত

শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রচন্দ্র রায়,—নেত্রকোণা।

তোমরা সকলেই রীতিমত উপাসনা করিবা। প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উপাসনার কাজ শেষ করিয়া যাহার তাহার কাজে প্রবৃত্ত হইবা। মধ্যাহ্নে সাধারণভাবে উপাসনা করিবা, সন্ধ্যার সময় ও শুইবার সময় জপ, প্রাণায়াম, মধ্যে মধ্যে পাঁচ হাজার, দশ হাজার জপ ধ্যান প্রার্থনা করিবা। ঠাকুর ঘর, ভোগের ঘরে সকলেরই যাওয়া নিষেধ।

কেবল যে সেবা পূজার কাজ করিবে, সে যতক্ষণ কাজ করিবে ততক্ষণ থাকিবে। অতিরিক্ত সময় এবং বিনা প্রয়োজনে সেবাইতও যাইতে পারিবে না। অতিরিক্ত বাক্যব্যয় করিতে পারিবে না। কেহ কোন কটূক্তি করিলে, অতি নম্রভাবে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর লইবে। অযথা সময় নষ্ট করিবে না। সকলকেই আপন জানিয়া ভালবাসা দিবে। কেউর সঙ্গে ইয়ারকি দিবে না। যাহাতে উচ্চভাব নষ্ট না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। জগৎটাকে ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপ ভাবিয়া একটি কীটানুকীটকেও হেলার চক্ষে দেখিবে না। ভুলেও অসত্য বাক্যব্যয় এবং অসত্য ব্যবহার করিবে না। ভালবাসার জন্য দুইজন একত্রে শুইবে না। অহমিকাই যে নীচ প্রকৃতি তাহা ভাবিয়া নিরহঙ্কারে অপরের নিকট হইতে উচ্চভাব গ্রহণ করিবে। প্রসাদ পাওয়ার সময় অন্ততঃ ২।১ গ্রাস কম পাইবে, ভরা পেটে রাত্রের উপাসনা হয় না। অতএব রাত্রে কম প্রসাদ পাইয়া দমের ক্রিয়া দ্বারা তাহা পূরণ করিবে। তামাক ক্রমে কম খাইবে। এই সকল নিয়ম সর্ব্বদা পালন করিবে, নচেৎ মন অজ্ঞাতসারেও নিম্নগামী হইয়া পড়িবে। ছাত্রদিগকেও এই ভাবে চলিতে হইবে।

এই যে ভিক্ষুগণ ভিক্ষায় যায়, এবং গৃহস্থগণ কেহ বা তিন বেলা স্থানে দুই বেলা, আর দুই বেলা স্থানে একবেলা, কাহারও বা প্রত্যহ ঘটেও না। সময়ের গতিকে এবার এরূপ হইয়াছে—ইহাতে মনকে দুর্ব্বল করিতে নাই। আর প্রাচীন কালেও (যাহাকে সত্য ত্রেতা দ্বাপর বলে) অনেক সময়

দুর্ভিক্ষাদি অভাব অনটন হইত। আর এই অভাব অনটন না হইলেই কি? আমার পূর্ব্বাপর স্মরণ করিলে দেখিতে পারিবা যে, সাধনাবস্থায় প্রায় ১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ৮।১০ দিন খাওয়া ঘটিত কিনা সন্দেহ। এমন কি আমি ১৪।১৫ বৎসর বয়সে দীক্ষিত হই, ইহার পূর্ব্বেও আহার সংযম, নানা উপবাসাদি করিয়াছি, এই তখনকার কথা ; এক সময় আহার সংযমকল্পে নিয়ম করিলাম দুই বেলাই খাওয়া, কিন্তু ৮।১০ গ্রাস। এইভাবে প্রায় দেড় মাস যায়, এসব দেখিয়া আমার ছোট মা (গর্ভধারিণী) আহার ছাড়িয়া দিলেন, এমন কি ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত জলও গ্রহণ করিলেন না। ক্রমে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন, তিমি সঙ্কল্প করিলেন অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিবেন। তখন আর মায়ের কষ্ট দেখিয়া ঠিক থাকিতে না পারিয়া মার পায় ধরিয়া কান্নাকাটি করিয়া মায়ের সঙ্কল্প ভঙ্গ করি, আর আজ পর্য্যন্তও আশ্রমের শিশুদিগকে একাদশী, অম্বুবাচী ইত্যাদি করিতে হয়। টোলের ছেলেদের সম্বন্ধেও এত না হউক যথালব্ধ সন্তোষভাব আনিতে উপদেশ দেওয়া উচিত। আর ভিক্ষুগণ আহার সংযম করিবেই করিবে। "আহার টুটিলে টুটে ইন্দ্রিয় বিক্রম।" কেবল অনাহারে থাকিতেও আমি বলিতেছি না। তবে কথা এই যে, সংযম অভ্যাস না থাকা হেতু দেশটা শ্মশানে পরিণত হইতেছে। মনের বল নাই শান্তি নাই। আর হইতেছে এই যে দেশটা অভাব বোধ করিতেছে, ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আলস্য জড়তায় পরিপূর্ণ হইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব হারাইয়া

ফেলিয়াছে। আর ইহাও ঠিক, অধিক আহারে বা ভোগ বিলাসে এবং অভাব বোধ করিতে করিতে মস্তিষ্কের চালনা শক্তি লোপ হইয়া যায়। তাই লিখি মন স্থির রাখিয়া যথালব্ধ পাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। আর বিশেষ কি লিখিব, দেশের অভাব পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিও।

১৩২৯।২৬।৩ } আঃ
গৌরী-আশ্রম } ভারত

শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র ব্রতাচারী—তারাচাপুর।

পরমকল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রখানা পাইলাম। লিখিয়াছ যে, জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ কি? প্রতিমা পূজার উদ্দেশ্য কি? কিরূপে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিবেন?

জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদরূপ সন্দেহ নিবৃত্তিই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। ব্রহ্ম-চৈতন্যই ঘটস্থ অবস্থায় পরমাত্মা। এই পরমাত্মার আত্ম-স্বরূপ ভুলিয়া দেহাত্মবোধ হইলে তাহাকে জীবাত্মা বলে। তোমারই বন্ধন, তোমারই মুক্তি; স্থূলে আসিয়া সূক্ষ্মতত্ত্ব ভুলিয়াছ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা তোমার মনে নাই।

অভিমন্যুর মত এই দেহরূপ ব্যূহে প্রবেশ শিখিয়াছ; বাহির হইবার কৌশল জান না। তোমার দুর্ব্বুদ্ধি কাম-ক্রোধাদি ছয় রথী লইয়া সংগ্রামে তোমাকে জর্জ্জরিত করিতেছে, তুমি নিজকে সামলাইতে পারিতেছ না, সুখ দুঃখের তাড়নায় অস্থির—তাই তোমার বন্ধন।

চৈতন্যাবস্থায় অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্বাবস্থায় বন্ধন নাই। জীবন্মুক্ত ঋষিগণ এই অবস্থায় থাকিয়া জগতে বিচরণ করেন।

এই তত্ত্ব দীক্ষার সময় ব্রহ্মগায়ত্রী ও অজপাগায়ত্রী দ্বারা সাধারণ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি। ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ এই—"ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলিয়া জানি, পরতত্ত্ব জানিয়া ধ্যান করি, সেইভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব আমাতে হউক বা প্রেরণ কর অথবা প্রেরণ করেন।" এই তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য অজপার সন্ধান লইয়া আত্মশক্তির আশ্রয়ে উপাসনা প্রভাবে তদ্গত হও।

এই আত্মশক্তি কুণ্ডলিনীরূপে চতুর্দ্দলে থাকিয়া "হং-সঃ" জপ করিতেছেন, ইহাকেই অজপা গায়ত্রী বলে। শ্বাস নির্গম-কালে 'হং'কার, আর প্রবেশকালে 'সঃ'কার জপ হইতেছে। 'হং'কার পুরুষ, 'সঃ'কার প্রকৃতি। এই পুরুষ-প্রকৃতির অনন্ত নাম। উপাসক ভেদে কেহ রাধাকৃষ্ণ কেহ বা শিবশক্তি বলিয়া থাকেন। শ্বাস প্রবেশে দেহ জীবিত বা শক্তি সম্পন্ন হয়, তাই 'সঃ'কার শক্তিরূপিণী। শ্বাস নির্গমে, পুনঃ প্রবেশ না করিলে, দেহ নির্গুণ ও মৃত। পুরুষ নির্গুণ বলিয়া 'হং'কার পুরুষ। এই 'সঃ'কার-রূপিণী শক্তিকে জপ ধ্যান ও

প্রাণয়ামাদি দ্বারা আয়ত্ত করিলে সোঽহং হয়।

এই সোহহং-তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে দ্রষ্টৃত্ব আপনা হইতেই আসিবে।

✓তোমার বহির্ম্মুখী অবস্থায়ই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ বা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষরূপ ব্যূহে প্রবেশ। আর উপাসনা প্রভাবে অন্তর্মুখী হইলে যে সোঽহং আসিবে, ইহাই নির্গম বা নির্ব্বিকার অবস্থা।

✓বাহিরে প্রতি পদার্থ চিৎসত্ত্বা বা চৈতন্যরূপিণী মায়ের বিকাশ জানিয়া উপাস্যরূপে অবলম্বন বা উপাসনা করাকে প্রতীক-প্রতিমা পূজা বলে। ইহাতে চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়। চৈতন্য বা ব্রহ্মোপলব্ধিই পূজার হেতু বা উদ্দেশ্য।

আমার সাধনাবস্থায় কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিবার জন্য মায়ের কাছে আব্দার করিয়াছিলাম। মা বলিয়াছিলেন—"এইভাবে উপাসনা কর্‌তে থাক্, কুণ্ডলিনী আপনা হইতেই জাগিবে।" তাই লিখি, ক্রিয়া করিতে থাক, কুণ্ডলিনী আপনিই জাগিবেন।

১৩২৯।১৩।৪ } আঃ
গৌরী-আশ্রম } ভারত

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ—জগদল।

বড়মামা!

আপনার পত্রখানা পাইয়া আবার বাল্যকালের কথা স্মরণ হইল। হঠাৎ যেন একটি আনন্দের তরঙ্গ আসিয়া আমার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে।

মনে হইল, এমন মধুর বাৎসল্যমাখা 'হাঁরে, ওরে' ডাকের উপযুক্ত অদ্যাপি আমি সেই ভারত। আবার পরক্ষণেই যখন আমি নিজকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম যে, এ জীবনে কে আর আমাকে এমনভাবে টান দিয়া কোলে লইবেন, তখন অসহনীয় দুঃখ হইতে লাগিল। বড়মামা! তখন যে কিরূপ দুঃখ হইতে পারে, ব্যথার ব্যথী যাঁরা, তাঁরাই জানেন। তখন ত্রিতাপ-নাশিনী মা আমার এই অজ্ঞান সন্তানের তাপ নিবারণ করিবার জন্য আমাকে আশ্বস্ত করিলেন—"তুই বালক আছিস্ বালক থাক্।"

বড়মামা! বুঝিলাম যে বাৎসল্য-প্রেমই অযাচিত অহৈতুকী ভালবাসা। নচেৎ আমি জানিতাম না যে আমার জন্মস্থানের রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, কাহারও আদর ভাজন হইতে পারিব। কারণ শাস্ত্রে বলে, "সৎপুত্র কুলের ভূষণ।" কি লিখিব, এসব বিষয় ভাবিয়া নিজকে কৃত-কৃত্য মনে করিতেছি।

আপনি লিখিয়াছেন,—আমার সাধনাবস্থায় মাকে যেখানে স্থাপন করিয়া পূজা করিতাম, আবার সেখানে স্থাপন করিবার জন্য। ইহা আমার নিকট বলিবার কিছুই নাই, আমাকে

পঞ্চম বর্ষীয় বালক মনে করিয়া যাহা অভিপ্রায় হয়, তাহাই করিবেন।

আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসধর্ম্ম পালনের জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেব নদীয়ায় না যাইয়া শান্তিপুরে গিয়া তাঁহার মাকে দেখা দিয়াছিলেন। মায়ের ইচ্ছায় যখন বলিবেন, আমি আপনাদিগকে তখন দেখিতে যাইব।

১৩২৯।২৭।৪
গৌরী-আশ্রম।

আপনাদের স্নেহের—
ভারত

পর্য্যটক শ্রীমান্ মোক্ষদানন্দ—কাশ্মীর।

পরমকল্যাণবরেষু,

নানা কারণে তোমার চিঠিখানার উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া কিছু মনে করিওনা।

তত্ত্বমস্যাদি বিচার মানুষেই করিয়াছে। ইহা তত্ত্ববিদ্ ঋষিগণেরই বাক্য। যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। সাধক নির্গুণতত্ত্বে পৌঁছিয়া আবার যখন অহংতত্ত্বেআসিয়াছেন, তখনই বুঝিয়াছেন—"আমি সেই" বা "আমি তাঁহার।" সেই নির্গুণ পরতত্ত্বে না পৌঁছিয়া বলা শ্রুতির অনুমোদন মাত্র, অর্থাৎ শুনা কথা।

এই সোঽহং তত্ত্ব নানা সম্প্রদায় ও নানা মতাবলম্বীগণ

নানা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যেমন ব্রাহ্মণ্য মতে ভূতশুদ্ধি ও বৈষ্ণবাদি খণ্ড মতাবলম্বীদের শিক্ষামন্ত্র "হং-সঃ"। এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য সোঽহং অর্থাৎ আমি সেই।' মুসলমানী মতে 'আয়নাল হক্' ইত্যাদি।

শাস্ত্র জানিবার তাৎপর্য্য এই যে, গুরু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্যান্য ঋষিগণও বলেন কিনা। আর জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি— ইহারাও পরস্পর সমান; ইহাতে গৌণ মুখ্য নাই। 'ইতি ইতি' 'নেতি নেতি' ইহারাও পরস্পর সমান। কারণ 'নেতি' বলিতে যেমন ইহা না ভাবিয়া না করা যায় না, তদ্রূপ 'ইহা' (ইতি) শব্দের পশ্চাতেও কিছুই থাকে না।

যেমন জড়পদার্থে চৈতন্য-জ্ঞানে ধ্যাইতে ধ্যাইতে ধ্যেয় থাকে না অর্থাৎ ধ্যেয় ও ধ্যাতা লুপ্ত হইয়া কেবল ধ্যান (চৈতন্য-সত্ত্বা) থাকে, তেমনি নেতি নেতি বিচারে জড় বাদ পড়িলে শুদ্ধ চৈতন্য সত্ত্বাই থাকে।

চিত্তশুদ্ধির জন্য যেমন যোগশাস্ত্রমতে অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তি-মার্গের তেমনি অষ্টপাশ ছেদন, এতদুভয়ের ফল কিন্তু একই। মুখ্য উদ্দেশ্য মন স্থির করা। মন একটু সাম্য না হইলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহেরও ভাব আসে না। এই মন স্থিরের জন্যই জপ প্রাণায়াম ধ্যান ও ধারণাদি করিতে হয়।

শাস্ত্রালোচনা সাধনার পৃষ্ঠপোষক রাখিয়া স্থির ভাবে ক্রিয়া করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে, ইহাই প্রণালী। ক্রমে সমাধি লাভে পরতত্ত্বে পৌঁছিয়া স্থিতিলাভ করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়।

লিখিয়াছ যে, ইতিমধ্যে ২।৩ জন সাধক পাইয়াছ, তাঁহারা কেবল শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মজ্ঞ পাও নাই। কেন যে পাও নাই তাহা বুঝিতে পারি না। এতদ্দেশে আমার চক্ষেও একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ পড়েন না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছুই নাই।

আমি কিন্তু দেখিতেছি, শ্রবণ-মননশীল সাধকই খুব কম। এই যে প্রণব মন্ত্র, ইহা জপ করিতে করিতে কয়জন : হইয়া পড়ে? নচেৎ মন্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিলে প্রণবই সৃষ্টি হইতে লয়ে পৌঁছায়, অর্থাৎ অকারে সৃষ্টি (ইচ্ছার উৎপত্তি), মকারে লয় (ইচ্ছার নাশ), উকার ত স্থিতি-কালই (চৈতন্যাবস্থা বা জ্ঞানাবস্থা)। মনের চাঞ্চল্যেই পুন; পুনঃ ইচ্ছা হয়, এই ইচ্ছা দুই প্রকার—করিব, করিব না।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই যে বিষয় পঞ্চকের স্ফুরণ, ইহা মনের বহির্ম্মুখাবস্থা। যে পর্য্যন্ত ক্রিয়ার গৌণ মুখ্যরূপ সন্দেহ নিবৃত্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত মন স্থির হইতে পারে না। অস্থিরতাই মনের বহির্ম্মুখী লক্ষণ। ইহা যেমন সাধনা ও সিদ্ধির অন্তরায়, তদ্রূপ মনের সঙ্কল্প-বিকল্প ভাব অর্থাৎ করিব করিব না, কার্য্য বিষয়ে মনের ইত্যাকার যে সঙ্ক্ষোভ-বিক্ষোভ, তাহাও তেমনি সাধনা ও সিদ্ধির অন্তরায়। মনকে বিষয় বিশেষের সিদ্ধিকল্পে একান্ত উত্তেজিত করিয়া দেওয়া চঞ্চলতা মাত্র। চিত্তচাঞ্চল্যের পরিণাম যে অকৃতকার্য্যতা, ইহা অতি সহজেই বুঝা যায়। মনকে কোন বিষয়ে একান্ত উত্তেজিত না করিয়া স্বাভাবিক ভাবে (মনের স্থৈর্য্য পথে)

কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই সিদ্ধির নিয়ামক।

কোন স্কুলের কয়েকজন ছাত্র এক সময়ে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে বলিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলে তাহাদের আরও অধিক শুক্রক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল। যখন বুঝিতে পারিল যে বীর্য্য ধারণ করিব বলিয়া উৎকণ্ঠিত হওয়াও চঞ্চলতা তখন হইতে স্বপ্ন দোষও কমিতে লাগিল। চাঞ্চল্য স্থৈর্য্যের বিরোধী ভাব, বিরোধী ভাবই অসিদ্ধির কারণ, যেহেতু ইহা স্বরূপের বিপরীত। স্থির হও, সিদ্ধি তোমার করতলগত। বিশেষ কি লিখিব, পর্য্যটনে ঠিক ঠিক উপাসনা চলে না। আসিবার কথাই বা কি প্রকারে বলি। কারণ তোমার পছন্দমত পণ্ডিত মিলাইতে পারিব না। শ্রীমান্ শান্তিদানন্দ যে চিঠি দিয়াছে, তদনুযায়ী চলা শ্রেয়ঃ। ইতি।

১৩২৯।২৮।৭ } আঃ
গৌরী-আশ্রম। } ভারত

শ্রীমান্ শ্রীনাথ চন্দ—লালমা!

পরমকল্যাণবরেষু,

তোমার ঈশ্বর পরায়ণতার বিষয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আশাকরি জগদীশ্বর তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন।

ব্রহ্মচর্য্যই ঈশ্বর লাভের একমাত্র সহায়। ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ব্রহ্মে বিচরণ অর্থাৎ মনকে বাহ্যজগৎ হইতে অন্তর্জগতে স্থাপন বা শূন্যগত করা।

শূন্যগত হইলেই কামনা বাসনা বিদূরিত হয় ও শ্রীভগবানের কৃপালাভের অধিকারী হওয়া যায়।

যা হউক ভালই চলিয়াছ। তবে তুমি ছেলে মানুষ, তাই তোমাকে দুই একটি কথা বলিতে হইতেছে। সকল কাজই মানাইয়া করিতে হয়। পূর্ব্বে ঋষিরাও কঠোরতা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতেন, তাই তপস্যা করিতে অনেক দিন লাগিত। আমার পরমগুরু শ্রীশ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ও ফলমূল খাওয়া অভ্যাস করিয়া পরে দুইবার মাসাহ (১) করিয়াছেন। আর আমার জীবনটাও ছোটকাল হইতেই কেবল এইরূপ কঠোরতার ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। এই কঠোরতার পূর্ব্বে প্রাণায়ামাদি দ্বারা বায়ু ধারণ অভ্যাস করিতে হয়। সাধক প্রথমাবস্থায় নাসিকার অগ্রভাগ ধ্যান করিয়া চক্ষের জল পড়িলে পরে চক্ষু মুদিয়া

(১) একমাস নিরম্বু উপবাস।

নাভিতে ধ্যান করিবে। তুমি ছেলে মানুষ, উপাসনার ভাব নিজে নিজে ধরা খুব কঠিন, তাই উপদেষ্টা ছাড়া খুব আশঙ্কা থাকে। যদি বল উপদেষ্টা শ্রীভগবান্ প্রেরণ করিবেন, তাহা হইলে যাহা প্রেরিত হয়, মনের সঙ্গে মোটামুটি রকমে যোগ হইলে তাহাও গ্রহণ করিয়া পালন করিও। যেরূপেই হউক মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য নাভিতে অনুক্ষণ ধ্যান করিও।

মনে কর তোমার আকর্ষণে শ্রীভগবান্ দুই একদিন উপদেষ্টা তোমার নিকট প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তোমার উপদেষ্টার সর্ব্বদাই দরকার। অতএব এমন আইট্ করাও ঠিক নহে, অনুসন্ধান করিয়া উপদেশ গ্রহণ করা বিধি। . জ্ঞাত কারণ লিখিলাম। ইতি—

১৩২৯।২৮।৭ }
গৌরী-আশ্রম }

আঃ
ভারত

শ্রীমান্ মহেশচন্দ্র সরকার,—ধুবড়ী।

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রখানা পাইলাম। আমি জানি, একবার যিনি মায়ের কৃপার আভাস অনুভব করিতে পারেন কিংবা আভাস পাইয়াছেন, তাঁহার আর পতন নাই অর্থাৎ মা সন্তানকে কোলে লইয়া আছাড় দেন না; ইহা নিশ্চয় জানিয়া শান্ত থাকিও। বিশেষতঃ ইহা মনে রাখিও যে আমি মায়ের প্রেরিত, তোমাদের জন্যই। মা অবলম্বন ব্যতীত নিজে কিছুই করেন না, আমিও কিছু করি না। তাঁহার ইঙ্গিতেই সব হয়। কোন চিন্তা নাই। ইতি—

১৩২৯।১৫।৮
চিত্রধাম।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী—
ভারত

শ্রীমান্ শচীন্দ্রচন্দ্র রায়,—লক্ষ্মীগঞ্জ।

নবমিলনে সদানন্দেষু,

এই শুভ সম্মিলন উপলক্ষে পূর্ব্ব মহর্ষিগণের উপদিষ্ট কর্ম্মকাণ্ডের যথাযথ সদর্থ গ্রহণ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হওতঃ মনেন্দ্রিয় জনিত ক্ষণিক সুখ-বাসনা পরিত্যাগে, ব্রহ্মানন্দ বা বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া জগতে বিচরণ কর, ইহাই আমার ইচ্ছা বা উপদেশ।

আমি বৃক্ষতল-বাসী সন্ন্যাসী হইলেও, গার্হস্থ্যাশ্রমীদিগকে অযাচিতভাবে আত্মজ্ঞান উপদেশ দান বা তাহাদের জন্য ঋষি-ধর্ম্মানুসারে শ্রীভগবানের নিকট মঙ্গল কামনা করা সর্ব্বতো-ভাবে শ্রেয়ঃ মনে করি!

মানুষের ধর্ম্ম—তত্ত্বজ্ঞান লাভ। এই সৎপথে অগ্রসর হইবার জন্য যেমন সজ্জনের কৃপাকাঙ্ক্ষী (সঙ্গাভিলাষী) হইতে হয় অর্থাৎ পরোক্ষজ্ঞানে এক সৎ ভাবিয়া অর্চ্চনা বন্দনাদি সম্মান জনক ক্রিয়া দ্বারা তোষিতে হয়, তদ্রূপ দেব-পিতৃগণের অর্চ্চনাদি দ্বারা তাঁহাদেরও সন্তোষ বিধান করা বিধি।

বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণের একাত্মজ্ঞান লাভ হওয়ার দরুণ মহদাত্ম-জ্ঞানে সদ্‌ভাবে (মাধুর্য্যভাবে) সসম্মানে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন।

এই মহাভাবের এমনই মহিমা যে শ্বাপদাদি হিংস্রক জীবগণকেও সাদরে আলিঙ্গন করিলে ইহাদের হিংসাবৃত্তি দূরীভূত হইয়া আত্মানন্দে মগ্ন হইয়া পড়ে।

তাই লিখি, তোমরা উভয়ে কায়মনপ্রাণে, ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গুরুজনের উপদেশ ক্রমে এই ধর্ম্ম-সম্মিলনরূপ মহাব্রত সম্পাদন কর ; ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।

বিদেহ-মুক্তি কি জান? স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন দেহের অতীত (আজ্ঞাচক্রে) থাকিয়া জগদ্‌ব্রহ্মের লীলা দর্শন করা। এই অবস্থায় থাকিলেই দেখিতে পাইবে, কেহ কিছু করে না। প্রকৃতি-পুরুষের সান্নিধ্য-হেতু সৃষ্টি লয়াদি কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। তাই দেহ থাকিয়াও দেহাতীত অবস্থা।

১৩২৯।১৭।৮
চিত্রধাম।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী—
ভারত

শ্রীমান্ ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত, শ্রীমান্ হরেন্দ্রশঙ্কর বিশ্বাস, শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র সরকার ও শ্রীমান্ রামদয়াল দাস প্রভৃতির নিকট— *

পরমকল্যাণবরেষু,

সিদ্ধাশ্রমের সন্ন্যাসী প্রদত্ত বিবেক-উপহারের যে সকল শব্দ তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না, আমার ভাষাজ্ঞান না থাকায়, প্রতি শব্দের উত্তর না দিয়া উপহারের সার মর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বিবেক শব্দে জ্ঞান অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্ব। এই দ্রষ্টৃত্ব জনক উপদেশই বিবেক-উপহার। ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়াই দৃষ্টৃত্ব বা স্বামিত্ব। (১)

ব্রহ্ম সত্য, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরহঙ্কার। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি গুণ না থাকায় তিনি অকর্ত্তা দ্রষ্টা মাত্র। দ্রষ্টার সহযোগ ব্যতীত পরমা প্রকৃতির ক্রিয়া প্রকাশ পায় না; তাই তিনি জড় স্বভাবা। উভয়ের সহযোগে হ্লাদিন্যভিমানী শক্তি প্রকাশে, কর্ত্তা-ভোক্তাদিরূপে, সৃষ্টি-লয়াদি ক্রিয়া সম্পাদনে লীলারস আস্বাদন করিতেছেন; ইনিই সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর। সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, সম্পূর্ণ বীর্য্য,

---

* শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র রায়ের বিবাহোপলক্ষে সিদ্ধাশ্রমের সন্ন্যাসীগণ যে "বিবেক-উপহার" প্রদান করেন, তাহার ভাষা ও ভাব কোন কোন স্থলে বুঝিতে না পারিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারী বাবার নিকট সন্দেহ ভঞ্জনার্থ যে পত্র লিখেন; এই পত্র তাহারই প্রত্যুত্তর।

সম্পূর্ণ যশ, সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এই ষড়ৈশ্বর্য্য তাঁহারই বিকাশ।

তুমি সেই অর্থাৎ সৎ। তোমার সহযোগে তোমার সৎ-স্বভাবা প্রকৃতি, মাধুর্য্যভাবের (২) প্রকাশ রূপ শান্ত-দাস্যাদি ভাব-পঞ্চকে কোন প্রতীক-প্রতিমায় ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে (একাত্মজ্ঞানে) কর্ত্তা ভোক্তাদিরূপে, সৃষ্টি-লয়াদি ক্রিয়া সম্পাদনে অর্চ্চনাদি করিতেছেন। ইনিই অর্থাৎ তোমার স্বভাবই ভক্তি, তোমার দ্রষ্টৃত্ব হেতু তুমিও ভক্ত; অতএব ভক্তি ও ভক্তে অভেদ।

ক্রমে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ব পদার্থে দ্রষ্টা থাকা অভ্যাস করিতে পারিলেই বুঝিতে পারিবে যে তুমি সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। ভক্ত-ভগবান, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ খেলার নিমিত্ত মাত্র। ইহাই অদ্বৈতজ্ঞান বা পরাভক্তি।

মায়ের বিচিত্র লীলার ফেরে পড়িয়া তোমার ভ্রান্তি বশতঃ দ্রষ্টৃত্ব লোপ হইলে, অনাত্মবোধে দেহাভিমানী হইয়া নিজকে (দ্রষ্টাকে) কর্ত্তা ভোক্তাদি বোধে, দেহাদি জড় পদার্থে নানা উপাধিধারীরূপে, ক্ষণিক স্বর্গাদি সুখাভিলাষে দেবতাদির অর্চ্চনা করাকে দ্বৈত-জ্ঞান বা অপরা-ভক্তি বলে। ইহাই জীবত্ব বা মায়া।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন অঙ্গুলি সঙ্কেতে স্ববংশ নির্ম্মূল করিয়াছিলেন; ভক্ত-প্রবর দাতাকর্ণ একাত্মজ্ঞানে (৩) প্রলয় অর্থাৎ সংহাররূপ ক্রিয়া দ্বারা নিজপুত্র বৃষকেতুকে স্বহস্তে ছেদন করিয়া অতিথি সৎকার করিয়াছিলেন; রাজর্ষি-

জনক ও অম্বরীষ যেমন দ্রষ্টা স্বরূপ থাকিয়া রাজ্য পালন করিয়াছিলেন; তদ্রূপ তোমরাও দ্রষ্টা থাকিয়া লৌকিক-কার্য্য সম্পন্ন কর, অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় অকর্ত্তা দ্রষ্টা থাক, বিবেক-উপহার ইহাই বলিতেছেন।

মন্তব্য

(পত্রের চিহ্নিত স্থলের টীকা)

(১) তোমরা আহার নিদ্রাদি দৈহিক ক্রিয়া করিব না বলিয়া মনে করিলেও তাহা প্রকৃতির নিয়মে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বাধ্য হইয়া ইহা তোমার দেখিতে হয়, অর্থাৎ দ্রষ্টা থাকিতে হয়। এইরূপ একাত্মজ্ঞানে তুমি কিছুই কর না, কেবল দেখ, (প্রতিভাত হয়); ইহাই দ্রষ্টৃত্ব। আর সর্ব্বাবস্থায় দ্রষ্টা থাকিয়া শিষ্য কিম্বা স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়াই স্বামিত্ব।

(২) এই যে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দুইটি ভাব, ইহা কেবল ঈশ্বরের চক্ষে ভাব-প্রকাশক লীলা-বর্দ্ধক মাত্র। জীবের পক্ষে ঐশ্বর্য্য, অনাত্মবোধে (দেহাভিমানে) জীবত্ব মাত্র। মাধুর্য্য, একাত্মজ্ঞানে আনন্দরসের বা মুক্তি লাভের সহায়ক।

(৩) স্থাবরে জঙ্গমে, আকাশে, পাতালে অর্থাৎ জগদ্ব্রহ্মে আত্মার নিরাকার ভাব স্ফুরিত হওয়া বা দ্রষ্টৃত্ব রাখাই একাত্মজ্ঞান। ইতি—

১৩২৯।২৫।৮
বাউসী বাজার।

আশীর্ব্বাদক—
ভারত।

শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র সরকার—মসূয়া।

নিরাপদে দীর্ঘজীবেষু,

তুমি আমায় চাও বা না চাও,
তা'কি আমি দেখি ?
তোমায় ভাল লাগে তাই, আমি
পাছে পাছে থাকি !!

তুমি কায়া, আমি ছায়া, ভিন্ন কভু নই।
(কেবল) 'দেহ তুমি' এই অভিমান, নইলে
একই একই ॥
আমি তোমার ধ্যান হইলেও
তুমি আমার প্রাণ !
ফিরিয়া দেখিতে চাও না,
ইহাই দেহাভিমান ॥

সংসার সংগ্রামে আমায় করে লও সারথী।
দেখিবে, পাইবে শান্তি, হে বাল-মতি ॥
সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সকল বস্তুতে।
একাত্ম-জ্ঞানেতে আমায় হইবে দেখিতে ॥
অকর্ত্তা হইয়া কেবল লীলা দেখে যাও।
প্রকৃতিই ঘটনার মূল, এই বুঝিয়া লও ॥

১৩২৯।৯।৯
দশহাল। } আঃ
ভারত

জনৈক ভক্ত বা শিষ্যকে লিখিত—

মানুষ যতদিন মুক্ত বা স্বাধীন না হইতে পারে ততদিনই দুঃখ যন্ত্রণা অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। দেহ ধারণ করিলেই 'আমি দেহ' এই ভ্রান্তি-বোধ জন্মে। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বনে উপাসনা করিতে করিতে আত্ম-স্বরূপ অর্থাৎ নিজকে অবগত হইয়া জরা মরণাদি ভয় দূর হইলে অমরত্ব বা স্বাধীনতা লাভ করিয়া জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন। তখন নানা দেহে, নানা পদার্থে এক সত্তারই বিকাশ জানিয়া আত্মপর ভেদ রহিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

এই যে বর্ত্তমান জগতে—আধি-ব্যাধি, জ্বালাযন্ত্রণা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমা, যুদ্ধবিগ্রহ, হিংসাদ্বেষাদি নানা প্রকারের অশান্তি দেখিতেছ, ইহা কেবল অনাত্মবোধে অর্থাৎ দেহাদি জড় পদার্থে আমি আত্মা বোধে ক্ষণিক সুখাভিলাষে কামনা বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া শোক-দুঃখ রূপ ভীষণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

তোমাদের অশান্তি দেখিলে অবশ্য খুবই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই চিন্তা কয়টি লোকের দেখিতেছ? যাহা হউক, যখন—জাগিয়াছে তখন আর আলস্য করিও না। যাহা লিখিতেছি তাহা বুঝিয়া করিতে চেষ্টা করিও।

তোমার অশান্তির কোনই কারণ নাই। কেবল নিজেকে জ্ঞাত না থাকায় তোমার অশান্তি। জীব আপনাকে দেহ-মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কারাদিতে 'আমি' এবং ক্ষণিক দেহাদি নানা জড় পদার্থে 'তুমি' বা 'তিনি' বোধ করিয়া আনন্দাভিলাষে সুখের

উপকরণ স্বরূপে গ্রহণ করিলে অনাত্মবোধে ইহার আবির্ভাবে সর্পে রজ্জু ভ্রমের ন্যায় সুখ ও তিরোভাবে দুঃখ অর্থাৎ সৃষ্টি লয়াদিতে অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে; ইহাকে জীবত্ব, অনাত্ম-বোধ, অথবা দ্বৈতজ্ঞান বলে।

ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া, আত্মা-তেই স্থিতি লাভ করিতে পারিলে একাত্মজ্ঞানে অর্থাৎ দেহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকারাদির কিছুই আমি নহি; আমি—সত্য নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরহঙ্কার, সুতরাং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি গুণ না থাকা হেতু আমি অকর্ত্তা, দ্রষ্টাস্বরূপ থাকায় দেহাদি ক্ষণিক জড় পদার্থের সংযোগ-বিয়োগ-রূপ গড়া ভাঙ্গা খেলা জানিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়া জগতে বিচরণ কর। ইহাকেই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলে।

ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনে অর্থাৎ ব্রহ্মে বিচরণ করার উপায় অবলম্বনে, আর ব্রহ্মে বিচরণ অর্থে ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়া অর্থাৎ তদ্গত হওয়া। শাস্ত্রে কথিত আছে—বীর্য্য ধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্যধারণ করিয়া এই ব্রহ্মভাবাপন্ন হইতে হইলেই মন স্থির করিতে হইবে। ধ্যান-ধারণা-সমাধি মন স্থিরের প্রধান উপায়। বীর্য্য ধারণ না করিলে শত চেষ্টায়ও মনের শক্তি জন্মিবে না।

আর আমিও একাত্মজ্ঞান লাভের জন্য অর্থাৎ একাত্মজ্ঞান হওয়ায়, উভয় আশ্রমের লোকদিগের প্রতি প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাতও করি নাই। এমন কি গর্ভধারিণী মাতৃ দেবীকে ন্যূনাধিক ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বনবাসে রাখিলাম। যদি

আমার দেহাত্মবোধ থাকিত তবে তাহা পারিতাম না। এই দ্রষ্টৃত্ব হেতু আমি তোমাদের হাজার হাজার লোকের আদরণীয় হইয়াছি। আমার নিজের দেহ-বোধ থাকিলে অম্লান চিত্তে আনন্দে সব দুঃখ বরণ করিয়া লইতে পারিতাম না।

তাই তোমরা চিন্তাকর আমাকে এবং অন্যান্য অবতার-বৃন্দের জীবনী স্মরণ করিয়া দেখিবে সকলেরই এইরূপ মন-বৈগুণ্যের কারণ দেহের মায়া।

১৩২৯।১১।৯ দশহাল। } আঃ ভারত

শ্রীমান্ কুমুদানন্দ—নেত্রকোণা।

ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের ছেলেদিগকে বলিও একটুকু কঠোরতার ভিতর দিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় চলিলে সংযম সাধন করা হয়। এই সংযমই যোগের বা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। আর সংযমের মধ্যে আহার সংযমই প্রধান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমৎ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—"আহার টুটিলে টুটে ইন্দ্রিয় বিক্রম"। আমিও বুঝিয়াছি, ইহাতে মন খুব শক্ত—বলীয়ান্ হয়। তোমাদের দেশটা কিন্তু নিতান্ত অসংযমী—তাই দেশটা মারা পড়িতে বসিয়াছে। হাজার টাকা ঋণ! বাজে খরচ বৎসরে পাঁচশত টাকা! পাকা সংসারীই হও আর সন্ন্যাসীই

হও—সংযম মানবের চিরসাথী। সংযমী পুরুষ যখন যেভাবে যে স্থানেই থাকুন না কেন তাঁহার অশান্তি হবে না ; অতএব "স্বদেশ ভুবন ত্রয়"। আমি শুনিয়াছি তিন্তিড়ী অর্থাৎ আম্‌লী পাতা সিদ্ধ জল খাইয়া তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ একজন ঋষি বহু পরিশ্রম করিয়া শাস্ত্র লিখিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়েও শ্রীমৎ শ্রীরূপগোস্বামী কেবল আকাশ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এসব কেবল ছোটকাল হইতেই সংযমের ফল। অর্থাৎ পূর্ব্বে বাল্যকাল হইতেই যম নিয়মাদি ব্রত পালনের সঙ্গেই ধর্ম্মশাস্ত্র এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প বাণিজ্য, শস্য উপার্জ্জনের জন্য গৃহস্থী (কৃষিকার্য্য), এমন কি স্বাধীনদেশ ছিল বলিয়া দেশরক্ষার জন্য ধনুর্ব্বিদ্যা অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। তবে এই সব শিক্ষা দেওয়া হইত প্রকৃতি ভেদে। বর্ত্তমানে এই সব নিয়ম প্রণালী না থাকাতে লোক সুখী হইতে পারিতেছে না। তাই লিখি, কেহ মনের দুর্ব্বলতা আনিও না। কিছুকাল পরে বুঝিতে পারিবা যে ইহাতে তোমাদের উপকারই হইতেছে।

১৩২৯।১৪।৯ } আঃ
গৌরী-আশ্রম। } ভারত

শ্রীমান্ কুমুদচন্দ্র শীল—নাঙ্গাইল

পরমকল্যাণবরেষু,—

নানাকারণে তোমার চিঠিখানার উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। মনে কিছু করিও না।

যাহা হউক, মাতৃ-মূর্ত্তিকে সাপিনী বাঘিনী বলা একেবারে অজ্ঞানতা মাত্র। বাঘ সাপ কিন্তু তোমার মনে। মন শব্দ স্পর্শাদি বিষয় পঞ্চকের দ্বারা বাহিরের নানা পদার্থে শ্রীভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য দর্শন করিলে দেহাত্মবোধে ভোগস্পৃহা জাগিয়া ক্ষণিক সুখাভিলাষে কর্ত্তা ভোক্তা হইয়া নানা অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে, ইহাই মায়া।

কামনাই কামিনী। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতে করিতে উপাসনা প্রভাবে দেহাত্মবোধ নষ্ট হইয়া আত্মতত্ত্বে স্থিতিলাভ করিলে বাহিরের মনোহারী পদার্থ সকল খেলার খেল্না জানিয়া বস্তুর অনিত্যতা দৃষ্টে গড়া ভাঙ্গাতেও বিচলিত হইতে হয় না।

অতএব লিখি, ঠিক্ ঠিক্ ভাবে উপাসনার উপায়গুলি অবলম্বন কর। শ্রীভগবানের শ্রীপদে কর্ম্মাকর্ম্ম অর্পণ করিতে শিখ। বিবাহ সম্বন্ধে হাঁ বা না কিছুই করিও না, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা তিনিই পূর্ণ করিবেন।

মনে রাখিও, তুমি দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি কিছুই নও। তুমি কিছুই কর না। তিনিই সব করিতেছেন, তুমি অকর্ত্তা দ্রষ্টা মাত্র, অর্থাৎ লীলা দর্শনেই তোমার আনন্দ।

আর বিশেষ কি লিখিব, আমার আশ্রমে যাওয়া হইলে দেখা করিও। ইতি—

১৩২৯।১৮।৯ রাণাগাঁও। আশীর্ব্বাদক— ভারত।

শ্রীমান্ রাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—সদয়পুর।

নিত্যনিরাপৎসু—

তুমি যে দাম্পত্য-প্রেম সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছ, ইহা সাধারণ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। স্ত্রী-পুরুষের ভগদ্ভাবে মিলনই দাম্পত্য-প্রেম। ভক্ত ভগবানকে যেমন শান্ত দাস্যাদি পঞ্চভাবেই ভাবনা করিয়া থাকেন, তেমনি স্বামী-স্ত্রীতেও এই পঞ্চভাবে ভাবনা করা যায়, ইহা শাস্ত্রীয় কথা। তবে স্বামী, স্ত্রীকে কন্যা, ভগিনী বা মাতৃ জ্ঞান এবং স্ত্রী স্বামীকে পিতা, পুত্র বা ভ্রাতা জ্ঞান করিবে, এমন নহে।

কথা এই যে, উভয়ে পরস্পর একাত্মজ্ঞানে ভক্তির চক্ষে শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চভাবেই ভালবাসিবে। যেমন পিতামাতা শিশু সন্তানকে বাৎসল্যের টানে অবিচারে দাস্য-সখ্যাদির মত আদর করিতেও কুণ্ঠিত হন না, তদ্রূপ স্বামী-স্ত্রীতেও উপাস্য জ্ঞানে নিষ্কাম বাৎসল্য ভাবের উদ্দীপনা হওয়া চাই।

ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষ বাৎসল্যের বিরোধী জানিবা। এইরূপে বহুদিন বীর্য্যধারণের ফলে ভগবদিচ্ছায় সন্তানের প্রয়োজন হইলে, সন্তানের জন্য ঋতুরক্ষা করিবে; ইহাই শাস্ত্রীয় কথা।

পূর্ব্বে কিন্তু ঋষিদের বাক্য দ্বারাও ঋতু রক্ষা হইত। কালবশে বর্ত্তমান সময়ে তেমন স্থিত-প্রজ্ঞ বাক্য-সিদ্ধ মহাপুরুষ গার্হস্থ্যাশ্রমে দেখা যায় না। আর তজ্জন্যই দেশের এই দুরবস্থা।

প্রকৃতি পুরুষের মিলনকালে উভয়ে জপ ধ্যান প্রাণায়ামাদি দ্বারা মন স্থির করিয়া মস্তকের চারি পাঁচ অঙ্গুলি উর্দ্ধে ধারণ করিবে, তখন সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গনেও মন বিচলিত হইবে না। জানিবা, শুদ্ধ মাধুর্য্য রসাস্বাদনই মিলনের হেতু। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা মিলনের হেতু বা উদ্দেশ্য নহে। ইতি—

১৩২৯।২৮।৯ মধ্যনগর বাজার। } আঃ ভারত

শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র ব্রতাচারী—তারাচাপুর।

এসব তোমাকে দীক্ষিত করিবার সময়ই বুঝাইয়া দিয়াছি। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে, পূজাদির সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়।

এই অব্যক্ত বিষয় বলিতে হইলে ও অশ্রোতব্য বিষয় শুনিতে হইলে শ্রোতার কর্ণে শুনিলে শুনা যাইবে না। ভাবে অনুভবের দ্বারাও বুঝিতে হইবে, ইহারই নাম শ্রবণ।

একটি তত্ত্ব, তাহাকে সাধক অন্তরে অর্থাৎ ভিতরে দেখিতে গিয়া আত্মা বলিয়া থাকেন, আর বাহিরের দিকে দেখিতে

গিয়া ঈশ্বর বা মা বলিয়া থাকেন। আর এই অন্তরে বাহিরে কূল না পাইয়া অর্থাৎ মন বুদ্ধির অগোচর জানিয়া—অসীম বুঝিয়া ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। ইহাই গুরুর মুখে বুঝিয়া লওয়ার নাম দীক্ষা বা উপনয়ন। আর ধর, ব্রহ্ম-বীজ বা গায়ত্রী। এই ব্রহ্মগায়ত্রী দ্বারা সাধারণভাবে ব্রহ্মকে আত্মা-স্বরূপে বহিঃশক্তির ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয়। এই ব্রহ্ম-গায়ত্রী আবার একরকম নয়, সাবিত্রী-গায়ত্রীকেও ব্রহ্মগায়ত্রী বলে। এই যে তোমরা এখান হইতে যে গায়ত্রী পাইয়াছ, এই গায়ত্রী অবগত হইলেই বুঝিতে পারিবা। যেমন 'ওঁ পরমাত্মায়ৈ বিদ্মহে' অর্থাৎ ব্রহ্ম পরমাত্মা বলিয়া জানি, 'পরতত্ত্বায়ৈ ধীমহি' অর্থাৎ পরতত্ত্ব বলিয়া ধ্যান করি অর্থাৎ সকল তত্ত্বের অতীত জানিয়া ধ্যান করি। 'তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মভাব আমাতে প্রেরণ কর বা দাও।

এই সকল তত্ত্বের অতীত বা পরতত্ত্ব বলিলেই ইহার পূর্ব্বে আরও তত্ত্ব আছে বুঝায়। এই তত্ত্বই স্থূলাকারে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত বা পঞ্চতত্ত্ব সূক্ষ্মাকারে মন বুদ্ধি অহং ইত্যাদি। এই সবের পরের তত্ত্বই পরমাত্মা। আর মন হইতে অহংতত্ত্ব পর্য্যন্ত জীবের বদ্ধাবস্থা—ইহাকে সূক্ষ্মদেহ এবং এই পর্য্যন্ত যাহার গতি তাহাকেই বদ্ধ-জীব বলে। সাধন কালে যাঁহারা ইহার অতীত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে মুক্ত-জীব বলে। সাধক উপাসনা প্রভাবে অহংতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া স্থিতিলাভ করিতে পারিলেই তাহার সুখ দুঃখের অতীত হওয়াতে তাহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকে। ইহারা এই মহত্তত্ত্বাবস্থায় থাকিয়াই বহির্জগতের

ক্রিয়া সম্পাদন করেন। সাধকের অহংতত্ত্ব অতিক্রম করিবার সময় ভুল্ল হয়, অর্থাৎ জলে ডুব দিবার সময়ে অজ্ঞানাবস্থার মত ক্ষণিকের জন্য কিছুই মনে থাকে না, অর্থাৎ ক্ষণিকের জন্য মনই থাকে না। তখনই বলে যে, আমার একটু তন্ময়ভাব হইয়াছিল। ইহার পরে জ্ঞান হয়, ইহাকেই জ্ঞান বা চৈতন্য বলে; এই চৈতন্যই খাঁটি আমি। এই চৈতন্যেরই আমি তুমি অর্থাৎ এক বা একাধিক জ্ঞান কিছুই থাকেনা, কেবল আছি মাত্র, বলিবারও দরকার বোধ হয় না। শুধু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বা অবতারাদি এই অবস্থায় থাকিয়াও অঙ্গুলি সঙ্কেতের মত জগতের কাজ করিতে পারেন, ইহার অতীত তুরীয়াবস্থায়ও থাকিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে ইহার অতীতেও স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন। এই অবস্থাগুলি লাভ করিবার জন্য অজপার সন্ধান জানিতে হয়।

যাহা তোমার শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত জপ হইতেছে তাহাকেই অজপা বলে। এই পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম, ইনিই লীলার-ছলে স্পন্দিত হইয়া বায়ু আকার ধারণ করিয়া জলবিম্বসম এই প্রাণ-বায়ুরূপে ঘটস্থ হইয়া যাতায়াত করিতে 'হং' 'সঃ' এই দুইটি বীজ উচ্চারণ করিতেছেন; ইনিই জীব। করিতেছেন বিধায়, ইহা বন্ধ হইয়া গেলে যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ সোহহং হয়। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে "আমি" অহংভাব দূর হইয়া অর্থাৎ অহংতত্ত্ব অতিক্রম করার দরুণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী হয়। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরানুভূতি প্রস্ফুটিত হইলে কেবল প্রতিমাতে কেন,

আকাশে পাতালে বায়ুতে অনলে ঈশ্বর জ্ঞান উদিত হইয়া "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' জানিয়া উপাসনা করিয়া ঈশ্বর (সচ্চিদানন্দ) লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন।

আরও স্পষ্টভাবে লিখি—এই যে অজপা, শ্বাস বাহির হওয়ার সময় 'হং' এবং প্রবেশ করিবার সময় 'সঃ' উচ্চারণ হয়। 'সঃ'কার উচ্চারণ করিলেই জীব জীবিত থাকে বা শক্তি সম্পন্ন হয়। অতএব ঋষিগণ 'সঃ'কারে চ ভবেৎ শক্তি' বলেন। আর হংকার বহির্বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই হং যদি আর সঃ না হয়, তখনই দেহ অবল হইয়া পড়ে অর্থাৎ মরে—দেহ নির্গুণ হয়। যদি সাধন প্রভাবে হং সঃ সোহহং হয়, তবে নির্গুণ নির্ব্বিকার হইয়া মুক্তি লাভের অধিকারী হয়, ইহাই সাধন পদ্ধতি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যেমন জলবিম্ব হইলেও সাগরে রাশি-রাশি জল থাকে, এই অনন্ত জীব হইলেও এই "অখণ্ড মণ্ডলাকারং" ফুরায় না বা তাহার শক্তি অনন্তই থাকেন। ইহাকেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলে।

এই যে প্রাণ বায়ুর আভাস বলিলাম, ইহার সঙ্গে তোমার অর্থাৎ মন পর্য্যন্ত যে তুমি এই তোমার, অর্থাৎ মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, প্রাণবায়ু যত স্থির হয় মনও তত স্থির হয়। মন যত স্থির হইবে, শ্বাস প্রশ্বাসও তত স্থির হইবে। তাই ঋষিগণ জপ ধ্যান প্রাণায়াম ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে কেবল প্রাণায়ামাদিতে সিদ্ধিলাভ হয় না। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মশক্তির অনুগত হইয়া, আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সহযোগে মণি-

কাঞ্চনযোগের ন্যায় জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি এই ত্রিশক্তিকে অবলম্বন করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইবে।

১৩২৯।৪।১০ } আঃ
গৌরী-আশ্রম। } ভারত

শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার ধর

তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। তুমি লিখিয়াছ, উপলব্ধি ও লাভ এতদুভয়ে প্রভেদ কি? ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন ও বাক্য পাওয়াকে লাভ না উপলব্ধি বলে? হ্লাদিনী শক্তি লাভ হয় কিরূপে? হ্লাদিন্যাভিমানী হওয়া যায় কিরূপে?

ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন বা বাক্যাদেশ পাওয়াকে লাভ এবং ঐশীশক্তির প্রেরণা অনুভব করাকে উপলব্ধি বলা যায়। যে শক্তি প্রভাবে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করা যায় তাহাকে হ্লদিনী-শক্তি বলে। দ্রষ্টাই অর্থাৎ সচ্চিদান্দ স্বরূপ আত্মাই হ্লদিন্যা-ভিমানী (অভিমানী-স্বরূপ) অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলে দ্রষ্টাকে হ্লাদিন্যাভিমানী বলা যায়।

১৩২৯।১৮।১০ } আঃ
গাভী। } ভারত

শ্রীমান্ হেমচন্দ্র ব্রতাচারী

কল্যাণবরেষু,

এই যে দেখিতেছ, দেশে জাতি বিচার ও নৈষ্টিক আচার বর্ত্তমান যুগে যে ভাবে চলিতেছে, তাহা পূর্ব্বে এই ভাবে ছিল না। পুরাকালে ঋষিরা চিত্তশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ নিজকে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন রাখিবার চেষ্টায় রজস্তমোগুণ সম্পন্ন লোকের সংশ্রব বর্জ্জনের উপদেশ দিয়াছেন। কারণ অসৎসঙ্গ নিজকে অধোগামী করিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা কমাইয়া দেয়। যেমন কুভোজীর সঙ্গ করিলে কুভোজনের স্পৃহাই জাগিয়া উঠে।

চরিত্র সংশোধন হইলে আর এসব আশঙ্কা থাকে না। মোট কথা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনের প্রধান উপায়—অসৎ সংসর্গ ত্যাগ। উক্ত ব্রতচারীগণ খাবার বসিলেও এক হাত দেড় হাত অন্তর বসিবে, যেন একের শ্বাস অন্যে গ্রহণ করিতে না পারে। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক জলপাত্রে জলপান করিবে। কালক্রমে ইহা হিংসাদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া সমাজ নির্বিবশেষে পরিণত হইয়াছে; যেমন এক সমাজ অন্য সমাজকে ছুঁইওনা ছুঁইওনা ইত্যাদি।

এইরূপ আহার্য্য বস্তুও বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রও নিরামিষ আহারকে সাত্ত্বিক আহার বলিয়া থাকেন। আমার সাধনাবস্থায় বহুদিন পর্য্যন্ত নিরামিষ ভোগ দিতে হইত। কিন্তু মায়ের আবির্ভাব হইলে তাঁহার আদেশে আমিষ ভোগও দেওয়া হয়। তথাপি আশ্রমোচিত আচার রক্ষার জন্য কোন কোন আশ্রমে শুধু নিরামিষ ভোগেরই বন্দোবস্ত আছে।

ব্রহ্মচর্য্য অর্থে—ব্রহ্মে বিচরণ বা ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হওয়া। রজস্তমোগুণ হইতে ক্রমে মনকে সম্পূর্ণ সত্ত্বে আনিতে পারিলে ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হওয়া যায়। ব্রহ্মভাবই সর্ব্বোপরি ভাব। নচেৎ কেবল দুই একবার ঈশ্বর দর্শন হইলেও সিদ্ধিলাভ হয় না।

এই যে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে লিখিলাম, ইহা দুই প্রকার—বীর্য্যধারণ ও ব্রহ্মে বিচরণ। বীর্য্যধারণকেও কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া থাকেন।

অতএব ছেলেমেয়ে তোমাদের সকলকেই বলিবে, আমার আদিষ্ট উপাসনা দ্বারা একাগ্রতা ও ধারণা শক্তির বলে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ কর, অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্মিলন রূপ প্রকৃতি পুরুষের মিলনে (বিবাহে) মানব লীলার অধিকারী হও। ইতি-

আঃ

ভারত।

শ্রীমান্ ভুপেন্দ্র কুমার দত্ত রায়—গচিহাটা।

কল্যাণবরেষু,

গতকল্য তোমার চিঠি খানা পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। লিখিয়াছ, তোমাদের গ্রামে শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী আসিয়াছেন এবং ছেলে মেয়েরা মন্ত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। জানিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম।

মন্ত্র গ্রহণ সম্বন্ধে প্রাণের টান পড়িলে মন্ত্র-গ্রহণ করাইবা। মন্ত্রগ্রহণ ও প্রসাদ গ্রহণ এক রকম। যেমন প্রসাদ দেখিয়া শ্রদ্ধা হইলেই বিচার না করিয়া অর্থাৎ কোন্ দেবতার প্রসাদ খাব কিনা, এই বিচার না করিয়া গ্রহণ করিবে, কারণ সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক ; দেবদেবী তাঁহারই নামরূপ। তদ্রূপ এই যে দেশে প্রচারকগণ দেখিতেছ, তাঁহারা সকলেই এক ঐশীশক্তির প্রেরণায় কাজ করিতেছেন।

১৩৩০।৭।২ চিত্রধাম। } আঃ ভারত।

কুমারী লীলাবতী সরকার—লক্ষ্মীগঞ্জ কাছারী।

কল্যাণীয়াষু,

মা, তোর বালকসুলভ চিঠিখানা পাইয়া কত সুখী হইলাম, তাহা পত্রে কি লিখিব। সময় সময় এইরূপ পত্রাদি লিখিতে ভুলিও না।

আমি যে আসিব আসিব বলিয়া আসিতেছি না, ইহাতে মনে কিছুমাত্র দুঃখ বোধ করিও না। স্মরণ রাখিও—আমি সর্ব্বদাই তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

নিয়মমত জপ ধ্যান প্রাণায়াম ও পূজাদি করিতে ভুলিও না। উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় সাংসারিক কাজ করিও। দেখিও, হেলায় খেলায় সময় কাটাইও না। দরকারী

কথা ব্যতীত বাহুল্য বিষয়ে বাক্যব্যয় করিও না। ইহাতে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে ও উপাসনার বিঘ্ন ঘটায়। পিতামাতার উপদেশ অম্লানচিত্তে গ্রহণ করিও।

আর সাংসারিক কাজ করিতে হরদম্ (প্রতি শ্বাসে) মনে মনে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও যে, 'আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমার পাপ তাপ দূর কর, আমাকে নির্ম্মলা ভক্তি দাও, আমাকে গ্রহণ কর।' এই প্রার্থনা মন্ত্রবৎ স্মরণ রাখিও। মনে রাখিও দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা নাম না লইলে সিদ্ধিলাভ হয় না। যদি বল যে, ঘুমাইবার সময় কিরূপে নাম লইব ? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রতাবস্থায় সর্ব্বদা নাম লইতে পারিলে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নেও দেখা যাইবে। ইহাতেই একদণ্ডও বৃথা যাইবে না। আর স্বপ্নে যাহা দেখ, তাহা লিখিয়া রাখিও।

উপাসনা করিবার সময় যাহাতে অন্য কেহ না দেখিতে পারে এবং উপাসনার শেষে চক্ষু বুঁজিয়া অনেকক্ষণ নাভিতে ধ্যান করিও।

খুব ভোরে জাগিয়া উপাসনা করিয়া সকলের আগে সাংসারিক কাজ করিয়া ফেলিও। রাত্রিতে ঘুমাইবার সময় বসিয়া উপাসনা করিও, শুইলেও প্রার্থনা করিতে করিতে ঘুমাইও।

মানুষ যারা, তারা ঘুমাইব ইচ্ছা করিয়া ঘুমায় না। ঘুমাইবার ইচ্ছা বেহুঁসের অর্থাৎ তমোগুণী লোকের। দেখিও যাহারা তমোগুণী তাহারা ঘুম ভালবাসে, বাহুল্য বিষয়ে হাস্য কৌতুকে সময় কাটাইয়া ফেলে। ইহাতে মন চঞ্চল

হয় এবং কামনা বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া শোক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

আর বিশেষ কি লিখিব, সাক্ষাতে সকলই জানাইব। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সীতা সাবিত্রীর মত হও। আমার কথা মা ও বাবার নিকট বলিও। ইতি—

১৩৩০।১৬।৫ গৌরী-আশ্রম। } আঃ ভারত

শ্রীমান্ শঙ্করচন্দ্র সরকার—সুনই।

কল্যাণবরেষু,

এ পর্য্যন্ত নানা জায়গায় ভ্রমণে থাকার দরুণ তোমার চিঠির উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে। বোধহয় শীঘ্রই "গৌরী-আশ্রমে" পৌঁছিব।

লিখিয়াছ—জ্ঞান ও ভক্তিতে প্রভেদ কি ? প্রভেদ কিছুই নয়। জ্ঞান শব্দে প্রবুদ্ধ অর্থাৎ নিশ্চয় জানা। ভক্তি শব্দে নিশ্চয় জানিয়া মানিয়া লওয়া অর্থাৎ তদ্ভাবাপন্ন হওয়া।

আত্মা—চৈতন্য, অকর্ত্তা, দ্রষ্টা, সাক্ষী মাত্র। আর প্রকৃতি (চৈতন্যশক্তি) কর্ত্তা-ভোক্তাদিরূপে সৃষ্টিলয়াদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। এই উভয়রূপ জানাকে জ্ঞান, এবং প্রকৃতিকে কর্ত্তা স্বীকার করিয়া মানিয়া লওয়াকে ভক্তি বলে। এই আত্মা ও আত্মশক্তি অভিন্ন হেতু জ্ঞান ও ভক্তি অভিন্ন।

পুরাণে আছে, জগৎটাই প্রকৃতি। তাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও প্রকৃতি। অতএব আমি (আত্মা) ভিন্ন যাহা কিছু সকলেই প্রকৃতি। তাঁহাকে 'ইদংজ্ঞানে' মানিয়া লওয়াই ভক্তি।

দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে আলোচনায় জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, এতদুভয়ে প্রভেদ কি?

বর্ত্তমানের কর্ম্মপ্রেরণাকে পুরুষকার এবং অতীতের পুরুষকারকে বর্ত্তমানে দৈব বলা হয়। এই কর্ম্মপ্রেরণা বা মূর্ত্তাবস্থাকেই অবস্থা ভেদে দৈব, পুরুষকার, নিয়তি, প্রকৃতি ইত্যাদি নানা উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

লিখিয়াছ যে, দৈব-নির্ভরতা মহাপাপ। আচ্ছা, তুমি যখন নির্লিপ্ত, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি তোমার নাই, তবে আর কে আছে? কাহার উপর নির্ভর করিবে? আর নির্ভর না করিলেও ত তুমি কর্ত্তা হইয়া বস। তবে কথা এই, ভ্রান্তি বশতঃ নিজে কর্ত্তা সাজিয়া (আমি কিছু করিব না), দৈব যাহা করেন তাহাই হইবে, এইরূপ বলা মহাপাপ।

তুমিই লিখিয়াছ, ব্রহ্মের বিকাশই জগৎ। আবার প্রশ্ন করিয়াছ, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইলেন কেন? ইহাতে বুঝা যায় যে নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত হইলেন,—কেন?

জগৎটা ব্রহ্মের বিকার নয়, বিকাশ অর্থাৎ লীলা। যাহা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিপরীত, তাহাই বিকার।

জগৎ শব্দে গতিশীল, সৃষ্টিলয়াদি ক্রিয়াশীল অর্থাৎ অবস্থান্তর

দেখা যায় বলিয়া জগৎ, ইহা ব্রহ্মের স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতির প্রকাশ।

ভ্রান্তিবশতঃ নিজকে (আত্মাকে) ভোক্তা ভাবিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ করিব করিব না এরূপ ইচ্ছা, অনিচ্ছা হইলে তাহাকে বিকার বলে। ব্রহ্ম বা আত্মার নির্লিপ্ততা হেতু ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই, সঙ্কল্প বিকল্প নাই।

বুঝিবার সময় নিজকে (আত্মাকে) অকর্ত্তা দ্রষ্টা বুঝিতে চেষ্টা করিলেই ব্রহ্মের স্বরূপ স্মরণ থাকিবে, ভ্রম হইবে না। ইতি—

১৩৩০।২।৭ } আঃ
চিত্রধাম। } ভারত।

শ্রীমান্ হরচন্দ্র দাস—বাহাদিয়া।

আমি তোমাদের চিঠি অনুসারে আসিতে পারিলাম না। শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা উপলক্ষে উক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এখন আবার গৌরী-আশ্রমে শ্রীশ্রী৺দীপান্বিতা উপলক্ষে মায়ের কলেবর নূতন করিতে হইবে। অতএব তোমাদের ওখানে দীপান্বিতা উৎসবের পরে আসিলেই কয়েকদিন তোমাদের নিকট থাকিতেও পারিব বিবেচনা করিয়া শ্রীমান্ যোগদানন্দকে পাঠাইয়া দিয়া শ্রীমান্ ধীরানন্দকে এই কয়েকদিনের জন্য আমার নিকট রাখিলাম। তাহার মাতৃঠাকুরাণীকে

জানাইবা তিনি যেন কোন চিন্তা না করেন। বর্ত্তমানে তাহার ভাব ভালই দেখিতেছি।

এই যে সিদ্ধাশ্রমের সন্ন্যাসীদের নিরীশ্বরবাদ প্রচার, ইহার মূল কারণ শ্রীমান্ শান্তি। তাহা দ্বারাই সব ছেলের ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কি উদ্দেশ্যে যে শান্তি এ সব করিতেছে তাহা অন্যান্য কেহই অবগত নহে। সে যে কেবল আমার সঙ্গে জেদ্ করিয়া আমাকে খণ্ডন করিবার মানসে এত চেষ্টা করিতেছে তাহা আমিও কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেছি না। এইগুলি তাহার ছেলেমি এবং আব্দার বুঝিয়াই উদাসীন থাকিতেছি।

শান্তির এই রকম চরিত্র পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। তিন বৎসর পূর্ব্বে আশ্রমে একজন পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত আলোচনা করিবার পরামর্শ করিয়া শান্তি, যোগদা, মোক্ষদা, কুমুদানন্দ ও ধীরানন্দ খুব উৎসাহিত হইলে, ইহা আমিও অনুমোদন করিলাম। সকলেরই ইচ্ছা রহিল যে, আশ্রমের এবং অন্যান্য দুই একটি ছেলে সংস্কৃত শিক্ষা করিবে এবং উপাসনাও করিবে। তখন অবশ্য বাবা (শ্রীযুক্ত তারক চক্রবর্ত্তী) আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তবুও তাহাদের আব্দারে বাধ্য হইতে হইল। কাজও এক রকম আরম্ভ হইল। পরে আমি তাহাদের উপর ভার দিয়া বৈরাটী আসিলাম। কতকদিন পরে আবার শান্তি সকলকে পরামর্শ দিল যে, আমরা এই সব বাহিরের কাজ করিব না; কেবল উপাসনা করিব। এই ভাবে দুইবার আয়োজন করিয়া দুই বারই নষ্ট করিল। এই সকল

দেখিয়া শুনিয়া এক সময় বৈরাটী গৌরী-আশ্রমে কাঁঠালতলীর শ্রীমান্ উপেন্দ্র রায়, শ্রীমান্ মহেশচন্দ্র সরকার পণ্ডিত, অতুল এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিল ; তখন তাহারা এই সম্বন্ধে আমার নিকট এবং শান্তির নিকট জিজ্ঞাসা করায় শান্তি তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিয়া আশ্রম হইতে চলিয়া যায়। তাহার নানা রকম দুর্বুদ্ধি দেখিয়া তাহাকে পর্য্যটনের আদেশ দেই। এই সময় হইতে তিন বৎসর যাবৎ আমি লক্ষীয়া সিদ্ধাশ্রম ছাড়া হইয়াছি।

যা হউক, এ সকল প্রকাশ করা নিতান্ত লঘুতার প্রমাণ। অজ্ঞানতা বশতঃ লোকে কত কিছু করিয়া থাকে। আমার সর্ব্বদাই আশা করিতে হইবে যে জ্ঞান হইলে পর ভাল হইবে।

আর কেবল তাকেই কেন বলি। এই যে নিরীশ্বরবাদ বুঝাইতেছে—আমি সেই, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ নাই, কাজেই আমার সেব্য-সেবক ভাব থাকিতে পারে না। অজ্ঞান লোকগুলিও বুঝিয়া ফেলে,—হাঁ ঠিকই ত! আমি কাহাকে পূজা বন্দনা করিব ? এই সোহহংবাদই ভাল ; ঈশ্বরবাদ বা ভক্তিবাদ মেকার ভয়—দুর্ব্বলতা মাত্র।

কিন্তু একটু ডুবিয়া দেখিলেই প্রতিভাত হইবে যে, অহংকার (কর্ত্তৃত্বভাব) থাকার দরুণ অকর্ত্তা স্থলে দুর্ব্বলতা লক্ষণ বোধ হইতেছে, আর মেকার ভয় মনে করাও অহং ভাবের পরিচায়ক, কারণ যিনি দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার মধ্যে ভয় অভয়, সবলতা, দুর্ব্বলতা এসব ভাব থাকিতে পারে না।

তত্ত্বজ্ঞানী জানেন আমার দ্বিতীয় কেহ নাই, কিন্তু আমা

হইতে অভিন্ন আমার সৎস্বভাবা প্রকৃতি আনন্দের জন্য সেব্য-সেবক অর্থাৎ শান্তদাস্যাদি ভাবে খেলা করিতেছেন, ইহা তাঁহার স্বভাব। অতত্ত্বজ্ঞেরই দেহাত্মবোধে সঙ্কীর্ণতা মাত্র।

আবার আমার এই সৎস্বভাবা প্রকৃতির ষড়ৈশ্বর্য্যের বিকাশ বহির্জ্জগতে হইতেছে বলিয়াই এই শক্তিযুক্ত অবস্থাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন।

অতএব নিজকে (আত্মাকে) জানিবার জন্য বেদান্ত-চর্চ্চা করিবে, এবং প্রকৃতির মহিমা কথঞ্চিৎ জানিবার জন্য পুরাণাদি আলোচনা করিবে। পুরাণ আলোচনায় নিজের অকর্ত্তৃত্বভাব প্রস্ফুটিত হইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করে।

১৩৩০।৭।৯
চিত্রধাম, মাল্‌নী } আঃ ভারত।

শ্রীইন্দুভূষণ দত্তরায়—গাচিহাটা।

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রখানা পাইলাম। লিখিয়াছ, আমি বলিয়া থাকি "আমি তাঁর হয়ে গেছি।" ইহার অর্থ—আমি বুঝিয়াছি যে মায়ের কোলের শিশু আমি, অনন্তকাল কোলে আছি ও থাকিব। আমার জন্ম নাই, ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই নাই; আছে কেবল অনুভূতি। মায়ের বিচিত্র লীলা দর্পনের ন্যায় আমাতে প্রতিভাত হয়, অতএব আমি আনন্দ-স্বরূপ, অর্থাৎ

আমার কর্ত্তৃত্বাদি গুণ না থাকায় মা আমাকে নির্লিপ্ত, অকর্ত্তা, দ্রষ্টা ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। এই যে তোমরা ভ্রান্তি বশতঃ দেখিতেছ—যেমন আমি হাসি, কাঁদি নাচি, গাই, কত কিছু করি, এ সকল আমি করি না, করেন আমার মা। মা আমার জন্য কত কিছু করেন, তা কত লিখিব। শুধু আমার আবেগে (আনন্দাবেগে) মা বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাকে ভাবিতে ভাবিতে একেবারে আমি (অহং) হয়ে গেছে।

মা আপনা ভুলিয়া গেছে,
বাৎসল্যের টানে।
আমি হয়ে কথা কয়, আমি হয়ে শুনে॥
আমি হয়ে ঘ্রাণ লয়, আমি হয়ে দেখে।
(আবার) আমি তুমি দুই হয়ে—
রাখে আমায় বুকে !!

আমি মায়ের বড় বাৎসল্যের ধন। এই যে শব্দ স্পর্শাদি বিষয় পঞ্চক, কেবল আমার জন্য। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিও আমার জন্য, সৃষ্টি লয়াদি ক্রিয়া আমার জন্য। হাসি কান্নাও আমার জন্য। জন্ম মৃত্যু আমার জন্য, সুখ দুঃখ আমার জন্য।

শুধু আমার জন্যই নিদ্রারূপে মা, ক্ষুধারূপে মা, তৃষ্ণারূপে মা, ভ্রান্তিরূপে মা, পুষ্টিরূপে মা, দয়ারূপে মা, ক্ষমারূপে মা। আবার আকাশরূপে মা, বাতাসরূপে মা, তেজোরূপ মা, জলরূপে মা। এমন কি কেবল আমার জন্যই মা আমার একেবারে মাটি হয়ে গেছে। এই যে জগৎ দেখিতেছে

ইহাও আমার জন্য। জগৎটা আমার খেলা। যেমন শিশু থাকিলেই লোলাকাঠি, বাঁশী ইত্যাদি খেলনার দরকার হয়। আমি আছি তাই জগৎটার দরকার। আমার মা আছেন, তাই আমি আছি। আমার মা না থাকিলে আর আমি থাকিতাম না। আমাকে লইয়া মা বাবার নিকট গেলে, আমার আবেগে (আনন্দাবেগে) মায়ের আর অস্তিত্ব থাকে না, আমারও অস্তিত্ব থাকে না। এই অবস্থাকে তোমরা নির্ব্বিকল্প বা জড়সমাধি বলিয়া থাক। অতএব তোমাদিগকে বলিয়া থাকি "তুমি সেই" অর্থাৎ তুমি অকর্ত্তা, দ্রষ্টা, শিশুমাত্র।

তোমরাও মায়ের ইঙ্গিতে চালিত, ইহাই উপদেশের বিষয়, এবং এই তত্ত্ব জানিবার জন্যই সদ্‌গুরুর দরকার।

আরও লিখিয়াছ, "শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী সদ্‌গুরু কিনা, এবার সদ্‌গুরু কে কে আসিয়াছেন এবং শ্রীভগবান্ এবার কোন দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন? এই তত্ত্ব মা আমাকে বলিতেছেন না। এসব বিষয় শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলে আমার বিশ্বাস তিনি বলিতে সমর্থা হইতে পারিতেন।

আবার লিখিয়াছ, তিনি সদ্‌গুরু কিনা? ইহা আমি কি লিখিব? আমি শিশু কিনা, তাই নিজকে ওজন করিতে পারি না। অতএব নিরুপায় হইয়া আমার মা বাবারই পরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম। তুমিই লিখিয়াছ, শ্রীশ্রীমৎ চৈতন্য দেবের সময় মোটে সাড়ে তিন জন ভক্ত তাঁকে জানিয়া ছিলেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা নিজ ক্ষমতায়ই জানিয়াছিলেন;

নচেৎ তাঁহার কৃপার বৈষম্য-দোষ খটিয়া পড়ে। ইতি—

১৩৩০।২।৯ গৌরী-আশ্রম। } আঃ ভারত

শ্রীমান্ শিবেন্দ্রচন্দ্র রায়—দশহাল।

তুমি যে দুইটি প্রশ্ন করিয়াছ, ইহা আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। শ্রীভগবানের কৃপায় এই জ্ঞান লাভ হইলেই জীবের আত্মসমর্পণ হয়। তখনই জ্ঞান আমি বা কর্ম্ম আমি, এই দ্বন্দ্ব মিটিয়া জীব কেবল অকর্ত্তা, নির্লিপ্ত দাস হইয়া জগতে বিচরণ করিতে পারে।

তোমার প্রশ্ন এই যে, মানুষ মৃত্যুর পর এবং পর-জন্মের পূর্ব্বে নিজকে কিরূপ আকার বিশিষ্ট মনে করে?

অসিদ্ধ, অতত্ত্বজ্ঞ বদ্ধ-মানুষের স্থূলদেহ নাশের পর এবং পর-জন্ম ধারণের পূর্ব্বে নিজকে বহির্ব্বায়ু হইতে পৃথক এক খণ্ড বায়ুবৎ মনে করিয়া থাকে, এবং প্রকৃতি অনুযায়ী ইচ্ছামত জ্যোতিঃঘন হইয়া বহুরূপ ধারণ করিতে পারে, এবং নিয়মিত কাল অন্তে বাসনা অনুযায়ী আবার জন্মগ্রহণ অর্থাৎ আবার স্থূলদেহ ধারণ করিয়া থাকে।

আর সিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞ মুক্ত মানুষগণের মধ্যে মৃত্যুর পর কেহ মুক্তির বিধান অনুসারে যথাসম্ভব অবস্থিতি বা বিচরণ করিতে পারেন; এবং তিনি জানেন যে, স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ দেহের

অতীত তিনি প্রাণ বায়ু অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ তাহার অবলম্বন মাত্র। কিন্তু বাসনার লেশ থাকিলেও নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিতে পারেন না।

এই তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবৎ কৃপায় নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া দ্রষ্টা অবস্থায় লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন ; তখন ভগবদিচ্ছা এবং তাঁহাদের ইচ্ছা অভিন্ন। এই ভাগ্যবান্ পুরুষগণের জন্ম মৃত্যু নাই। দরকার বশতঃ নানা রকমেই জগতে বিচরণ করিতে পারেন। তাঁহাদের গতিও গোলক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঈশ্বর নির্দ্দেশে করিয়াছ, লিখিয়াছ যে তুমি সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে বিরাজিত ; জীব তোমার চৈতন্যেই চেতন, নিদ্রাযোগে স্বপ্নাবস্থায়ও তুমি বিরাজ কর, কিন্তু সুপ্তাবস্থায় জীব একেবারে অচেতন হইয়া পড়ে, তখন তুমি কোথায় থাক ?

ব্রহ্মচৈতন্য বা আত্মচৈতন্যেরই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা। সুপ্তাবস্থায় অর্থাৎ নিদ্রাযোগে জীব একেবারে অচেতন হয় অর্থাৎ অনুভূতি থাকে না। স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় অনুভূতি থাকে, এই অনুভূতি শক্তিই জীবশক্তি বা জীবচৈতন্য।

জীবের দুইটী অবস্থা—বদ্ধ ও মুক্ত। যে অনুভূতি নিজেকে এক খণ্ড সূক্ষ্ম বা স্থূল জড়পদার্থ মনে করিয়া ভ্রান্তি বশতঃ ইহার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী মনে করে এবং বাহিরের প্রতি জড়পদার্থকে সুখের সামগ্রী মনে করিয়া তাহার প্রাপ্তিতে সুখী, অভাবে দুঃখী বোধ করিয়া নানা জ্বালা যন্ত্রণা

অনুভব করে তাহাকেই বদ্ধ জীব বলে।

আর যে অনুভূতি নিজ দেহকে বাহিরের প্রতি পদার্থে মায়ের বিচিত্র খেলা অনুভব করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাকেই মুক্ত মানুষ বা বিদেহ মুক্ত বলে।

৩০।২২।৭ } আঃ
গৌরী-আশ্রম। } ভারত

শ্রীমতী পূর্ণশশী দত্ত রায়—কাঁঠালতলী

মা, তোমাদের নিকট হইতে আসিবার সময় তোমাদের ছেলেমেয়েদিগকে দুই একটি কথা বলিয়া আসিতে পারি নাই। যাহা হউক, তাহাদের জীবন গঠনের ভার শ্রীভগবান্ তোমাদের হাতেই অর্পণ করিয়াছেন। তোমরা যে ভাবেই গঠিত কর, সেই ভাবেই প্রস্তুত হইবে। ছোটবেলা হইতেই কঠোরতা, ঈশ্বর পরায়ণতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি তোমাদিগকেই শিক্ষা দিতে হইবে। পূর্ব্বকালেও এই রীতি ছিল, কালক্রমে কলির প্রভাবে সে সকল রীতি-নীতি লুপ্তপ্রায় হওয়াতে তোমাদের দেশের এরূপ দুরবস্থা দেখা দিয়াছে।

এই যে দেশের রাজাধিরাজ মহারাজই বল, আর পর্ণ-কুটিরবাসী ভিখারীই বল, সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে, আমার অভাব, আমি ঋণী; এই অভাব পূরণ করিতে পারিতেছি না ইত্যাদি। ইহার কারণ কি? কারণ কেবল

অভাববোধ। আবার অভাব বোধ হয় মনের সুখাভিলাষে— ইহাকেই বাসনা বলে। বাসনার নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ চিরশান্তি লাভ করিতে পারে না। এই বাসনার নাশ হয় কিসে? কেবল ঈশ্বরার্পিত থাকিলে। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া তদনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করিলে। অতএব তোমাদের ইহা করিতে হইবে যে সাংসারিক যতকিছু কাজ কর, পূর্ব্বে স্বপ্নে বা বাক্যাদেশ যাহা পাওয়া যায় তদনুযায়ী কাজ করা, ইহাকে আত্মসমর্পণ বলে।

যেমন তোমাদের বাড়ীতে ভোগরাগাদি সেবার কার্য্য চলিতেছে। তোমরা যদি রাত্রিতে প্রার্থনা করিয়া জানিতে পার যে, আগামী কল্য অমুক জিনিষ দ্বারা ভোগ লাগিবে, অথবা ভোগ লাগিবে না, তবে তোমাদের কত আনন্দ হইবে। তাই লিখি, তোমরা এবং তোমাদের মেয়ে ছেলে সকলেই রাত্রিতে প্রার্থনা করিবা যে, আগামী কল্য সেবার কি হইবে? এবং প্রত্যহ তোমাদের যে সকল কাজ চিন্তা করিয়া করিতে হয়, তাহাও মায়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া করিবা। যদি স্বপ্নেও কিছু না পাও তবে কোন আভাস পাইবার জন্য দিবাতেও সকলেই মনে মনে প্রার্থনা করিবা। এমন কি আভাস পাইবার জন্য তোমাদিগকে কঠোরতা করিয়া ক্রমে ক্রমে এই ভাবে কাজ করিতে করিতে বুঝিতে পারিবা যে, তোমাদের কোন বস্তুর অভাব বোধ না হইয়া কেবল কৃপার অভাব বোধ হইতেছে; তখন তাঁহার কৃপা লাভের জন্য সকলেই জীবন দিতেও ইচ্ছা করিবা।

এইভাবে তোমাদিগকে এবং ছেলে মেয়েদিগকে ও গঠিত কর ; তবেই তোমাদের সুখের জীবন লাভ হইবে। আর চিরকাল তোমরা মনের সুখে কাটাইতে পারিবে। এইভাবে শিশু-সন্তানকে তৈয়ার করা মাতা পিতার কর্ত্তব্য।

আর একটি কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিও। সেবাদির জন্য একটি পয়সা যেন ঋণ করা না হয়। কোন বস্তুর অভাব হইলে এবং পয়সা হাতে না থাকিলে মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিও যে "আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, তোমার সেবার কি হইবে বলিয়া দেও"। যদি কোন আভাস না পাওয়া যায় তবে ঘরে যাহা থাকে তাহা দ্বারাই ভোগ দিও। এমন কি কেবল চাউল থাকিলে, কেবল অন্নভোগ দিবা, আর যদি কিছুইনা থাকে তবে কেবল পূজা প্রার্থনাদি করিবা।

মায়ারবশে তোমাদের মনে হইতে পারে যে আমরা কিম্বা ২।১ দিন উপবাসীই রহিলাম, কিন্তু ছেলে মেয়েরা ত ক্ষুধায় অস্থির হইয়া উঠিবে। তাহা আমরা মাতাপিতার প্রাণে কিরূপে সহ্য হইবে। এমন অবস্থাও যদি আসে, আরও উপরের জ্ঞান আনয়ন করিও যে, শ্রীভগবান পালন কর্ত্তা সর্ব্ব জীবকেই পালন করিতেছেন। যে ছেলে মেয়ের জন্য আমরা এত ভাবনা করিতেছি, তাহারা যখন জঠরে ছিল তখন ত আমাদের কর্ত্তৃত্বাদি খাটিত না। এবং প্রসব কালেও কেবল তাঁহার নিকটই প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। তারপর কেবল আধিব্যাধি হইলে বাধ্য হইয়া ডাক্তার কবিরাজের কথায় সন্তানের মঙ্গলার্থ অবশের মত হইয়া ২।১ দিন রাখিতে হয়

এবং ভগবানকেই ডাকিতে হয়। তাই লিখি, আমাকে অন্ততঃ ডাক্তার কবিরাজের মত মনে করিয়াও আমার বাক্য পালন করিতে কুণ্ঠিত হইও না।

আর এই যে, চাকুরীর বিষয় বা অপরের সাহায্য প্রত্যাশা করা, ইহা একেবারে ভুল। তবে যদি মা আদেশ দেন, তবে ইহাকে প্রত্যাশা বলা যায় না। নচেৎ মনে মনে পছন্দ করিয়া হইলে ভুলই ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ আমি দেখিতেছি দেশের উকিল মোক্তার কিম্বা যে কোন চাকুরীয়া হউক না কেন —ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ভয়ানক ঋণগ্রস্থ এবং যাহারা কোনমতে অঋণী থাকিয়া চলিতেছেন, তাহাদেরও অভাব দূর হইতেছে না—ইহার মূলে কেবল আত্মনির্ভরতার অভাব।

আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, আমার এই আদেশ যাহারা পালন করিবে, শারীরিক ও মানসিক সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত এইকালে এবং পরকালে মায়ের কোলে থাকিয়া পরমানন্দে বিচরণ করিতে পারিবে।

আর একটি কথা কুমারী মেয়েদিগকে প্রত্যহ স্মরণ করিয়া দিও, তাহারা যেন সৎপতি লাভের জন্য মায়ের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করে। ইহাই তাহাদের ব্রত।

গৌরী-আশ্রম। ১৩৩০।৪।১০ } আঃ ভারত

শ্রীমান্ মোক্ষদানন্দ—হৃষীকেশ।

পরমকল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রখানা পাইয়া সমাচর অবগত হইলাম। তবে তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়া ঘটে না, কারণ প্রায়ই ২৫।৩০ খানা চিঠির গড় কাটিয়া লইয়া তৎপরের চিঠির উত্তর দিতে হয়। তাই প্রায় চিঠিরই উত্তর দিতে এইরূপ বিলম্ব হইয়া পড়ে, কিছু মনে করিও না।

লিখিয়াছ যে, আমি এত এত তীর্থ ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মনের মত সঙ্গ মিলিল না, এবং আপনার সঙ্গেও অনেকদিন কাটাইলাম। আপনিও যেমন প্রকৃত সত্যের উপদেশ দান করেন নাই, ভ্রমণেও তেমনি প্রকৃত সত্যের উপদেশ পাই নাই।

আমি বিস্মিত হইলাম যে, পর্য্যটনে বাহির হইয়া প্রায় সারা ভারত ভ্রমণ করিয়াও তোমার প্রকৃত সঙ্গ মিলিল না। ইহা তোমার ভুল। কারণ এই যে পুণ্যভূমি ভারত, যাহার তুলনা দিতে এ মরজগতে অন্য কোন স্থান নাই, এবং যে ভূমিতে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিস্বরূপ কোটি কোটি সিদ্ধ মহা-পুরুষ ও কত কত অবতারাদি পূর্ণাংশ কলারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহাদের সাধণার স্থান লীলাভূমি অনন্ত ক্ষেত্র পীঠে পরিণত হইয়াছে, অদ্য পর্য্যন্তও তাঁহারা অমরত্ব দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থূলে সূক্ষ্মে বিচরণ করিতেছেন, তবুও তুমি বলিতেছ কিনা যে, তোমার সৎসঙ্গ মিলিল না!

মায়ের আদেশে আমাকে যে সমুদয় তীর্থে ভ্রমণ করিতে

হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক স্থানেই তীর্থ-দেবতার অভয়বাণী পাইয়া আসিয়াছি। আমার সাধনাবস্থাতেইও কত দেবদেবী-রূপে কত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ এবং রামকৃষ্ণ অবতারাদি আবির্ভূত হইয়া আমাকে বর অভয় প্রদানে অনুরক্ত করতঃ সাধনায় অগ্রসর করাইয়াছেন।

তাই লিখি, দ্বৈতবুদ্ধি বিরহিত হইয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি নানারূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিয়া দেন। যদি বল যে দ্বৈতবুদ্ধি কেমন? যেমন তুমি লিখিয়াছ, "আপনার কুশল দানে সুখী করিবেন।" অথবা আরও লিখিয়াছ যে, "আপনি লৌকিক ব্যবহার রক্ষার জন্য বলিয়াছেন যে, "আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি।" তোমার এই উভয় বাক্যই ভ্রান্তি মূলক, কারণ যাঁহাকে 'সৎ' জ্ঞান করা যায় তাঁহাতে 'অসৎ' ভাবনা করা যায় না। যাঁহাকে মঙ্গল স্বরূপ জ্ঞান করা যায় তাঁহার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করা যায় না। ইহাকেই দ্বৈতবুদ্ধি বলে। মঙ্গলামঙ্গল দেহলক্ষ্যেবলা যায় যেমন, "আপনার শরীর কেমন আছে?"

লিখিয়াছ, "আমার যখন সংস্কারগত মলিন বাসনার অভ্যুদয় হয়, তখন স্মৃতিজ্ঞান একেবারেই থাকে না। আর যখন শাস্ত্র আলোচনা করি তখন মলিন বাসনা থাকে না। কি উপায়ে এই দ্বন্দ্বভাব দুর হইবে, উপদেশ প্রার্থনীয়।"

ইহার কারণ এই যে, কেবল অর্দ্ধতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চাহিলে বা অর্দ্ধতত্ত্বজ্ঞান জানিলে, এই প্রকার ভ্রান্তি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অর্দ্ধতত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে, পরে বলিব।

প্রথমে জানিতে হইবে যে, মানবের আত্মজ্ঞান লাভ করিবার আবশ্যকীয়তা কি? বিচার করিলে বুঝিতে পারিবা যে, কেবল দেহাত্মবোধে কর্ত্তৃত্বাদি অহংকার বশতঃ যে কামনা বাসনা, ইহাই জানিবার জন্য আত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। জীব আত্ম-স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে নির্লিপ্ততা অকর্ত্তৃত্ব আপনা হইতেই আসে, তাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

এই আত্মজ্ঞান লাভ কেবল আত্মসত্তাকে জানা বুঝায় না, আত্মশক্তিকেও জানিতে হয়। লোকে কথায় বলে—"কিঞ্চিদ্ধ্যানং মহেশ্বরঃ" অর্থাৎ মহাদেব প্রকৃতির (শক্তির) মহিমা কিঞ্চিন্মাত্র ধ্যান করিয়া ধ্যান-স্বরূপ হইয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব আসিবার অবসর রহিল না। কেবল পঞ্চমুখে রাম নাম গান ত্রিপুরারি! অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির মহিমা গাহিয়াই সময় পান না, দেহাত্মবোধে কর্ত্তৃত্বাদি আসিবে কি প্রকারে? তাই লিখি, কেবল চৈতন্য সত্তাকে জানিলে চলিবে না, চৈতন্য শক্তিকেও স্থূলে সূক্ষ্মে জানিতে হইবে ও তাঁর গুণগান করিতে হইবে। আরও বিশেষরূপে বলিতে হইলে, আত্মা—নির্লিপ্ত, অকর্ত্তা, আত্মশক্তি—কর্ত্তা ভোক্তারূপে সৃষ্টিলয়াদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, ইহা বিশেষরূপে জানাকেই পূর্ণজ্ঞান বলে।

মহামুনি বেদব্যাস আত্মবিচার করিতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তাদি কত শাস্ত্র প্রনয়ণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইলেন না। দৈবাৎ একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ব্যাসদেব তাঁহাকে

পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা সম্মানিত করিয়া বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ আমি বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াও শান্তি পাইতেছি না কেন? অর্থাৎ আমি আত্মবিচার করিয়াও নির্লিপ্ত থাকিতে পারিতেছি না কেন?" মহামুনি নারদ তদুত্তরে বলিলেন, মুনিবর! আপনি চৈতন্যসত্ত্বা বিশেষরূপে নির্ণয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই 'ইচ্ছা-ক্রিয়া-জ্ঞান' এই ত্রিশক্তি সম্পন্না চৈতন্য-শক্তিকে যে পর্য্যন্ত জানিতে চেষ্টা না করিবেন অথবা তাঁহার মহিমা যে পর্য্যন্ত জানিতে না পারিবেন, তাবৎ কিছুতেই শান্তি পাইবেন না। অতএব আপনি এখন প্রকৃতি বা ঈশ্বরের মহিমা জানিতে চেষ্টা বা বর্ণনা করুন, দেখিবেন যে অচিরেই শান্তি পাইবেন।"

মহামুনি নারদের উপদেশে ব্যাসদেব প্রকৃতির মাহাত্ম্য জানিতে চাহিয়া তাঁহার মহিমা বর্ণনা করিতে করিতেই কত ভাগবত পুরাণাদি রচিত হইয়া গেল। তিনিও মায়ের (১) লীলারস আস্বাদন করিয়া চিরশান্তি লাভ করিলেন।

শ্রীশ্রীমৎ চৈতন্য দেবের সময়েও ঠাকুর হরিদাস দিবারাত্রে তিন লক্ষ 'নাম' জপ করিতেন।

এই দেহাভিমান নষ্ট করিবার সহজ উপায় আর নাই। শ্রীরামচন্দ্র মায়ের পূজা করিয়া তাঁহার কৃপায় মহাপ্রতাপান্বিত রাবণ রাজাকে বধ করতঃ সীতা উদ্ধার করিলেন। আবার

(১) "যে নির্গুণ পরতত্ত্বে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড লয় পাইতেছে, যাহা হইতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইতেছে, ইনিই ব্রহ্মযোনি, আমাদের মা, শুধু আমাদের কেন; অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেরই মা।"

শতস্কন্ধ বধ করিতে যাইয়া যুদ্ধে অচেতন হইয়া পড়িলে সীতা দেবীতে সেই মহাশক্তির বিকাশ হইয়া এক পা অযোধ্যায় আর এক পা অহুলঙ্কায় স্থাপন পূর্ব্বক শতস্কন্ধকে বধ করিলে, শ্রীরামচন্দ্র সীতা দেবীকে মায়ের সংহার-রূপিণী কালীরূপে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে 'মা, মা' বলিতে বলিতে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

অতএব লিখি, বেদান্ত আলোচনা বরাবরই করিতে হয় না, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া কেবলা প্রকৃতির লীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করিতে সতত যত্নবান হও। আর তোমার স্থুল দেহেরও ইন্দ্রিয় দ্বারা মা ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞান শক্তি প্রকাশে যাহা করিতেছেন, ত্রিশক্তির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সর্ব্বদা এই সকল দর্শন করিতে ভুলিও না। যত বিষয়বৃত্তি দেখ, সে সব তোমার নয়, তোমার প্রকৃতির। ইহা নিশ্চয় জানিবা যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে 'কর্ত্তা' জ্ঞান করিবে, ততক্ষণের জন্য তুমি "অকর্ত্তা" থাকিবে।

তোমার পূর্ব্ব পত্রের উত্তরে আর কিছুই লিখিবার প্রয়োজন মনে হইল না। শঙ্করানন্দের চিঠির সঙ্গে মিলাইয়া যে চিঠি লিখিয়াছ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

এতদিন পরে বাল্যশিক্ষার কথা লিখিয়াছ। 'ক' আকার দিলে 'কা' হইল, ইত্যাদি। লিখিয়াছ—'জগৎ বাহিরে হয় নাই' ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত। আবার শ্রুতির প্রমাণ দিয়াছ, 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্'।

তোমাকে কে বলিল যে, ব্রহ্মের ভিতর বাহির সম্ভবে?

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি যেমন অভিন্ন, তদ্রুপ ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। তবে সাংখ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্লেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য 'প্রকৃতি' 'পুরুষ' বিভাগ করিয়াছেন ; যেমন সক্রিয় অবস্থাকে 'প্রকৃতি' ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে 'পুরুষ' বলিয়াছেন। এইরূপ নিষ্ক্রিয় নিরাকার নির্ব্বিকার অবস্থাকে কেহ কেহ কেবল 'ব্রহ্ম' এবং ব্রহ্মশক্তির স্বষ্টিলয়াদি বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া ইহাকে 'জগৎ' বলিয়াছেন মাত্র। মূলে 'ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি' অভেদ জ্ঞানে জগৎকে ব্রহ্মশক্তির বিকাশ বলিতে হয়।

তোমার এই স্বষ্টিতত্ত্ব লিখিবার তাৎপর্য্য কি, তাহা তুমিই জান। ইহা ত জ্ঞান-সঙ্কলিনীতন্ত্রে ছোট বেলায় পড়িয়াছি ঃ—

আকাশজ্জায়তে বায়ু র্বায়োরপন্থতে তেজঃ।
তেজরূপন্থতে তোয়ং তোয়াত্বপন্থতে মহীঃ॥ (১)

ইহাত প্রকৃতির মহিমা বর্ণনা মাত্র। তোমার দ্বিতীয় চিঠির সম্বন্ধে আর কিছুই লিখার প্রয়োজন বোধ হইল না। তবে এই মাত্র জানিয়া রাখিও—তোমার শ্রুতি যে স্থলে বলিয়াছেন—'কার্য্যকারণ' সেই স্থলেই আমি বলি, 'মায়ের বিচিত্র লীলা বা জগৎ।'

ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহাদেবকে কে সন্ন্যাস দিয়াছেন, তাহা খুঁজিয়া পাই না। আমাকে মানুষে সন্ন্যাস দিন নাই, মা স্বয়ং দিয়াছেন।

---

(১) আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ (অগ্নি), তেজ হইতে জল; জল হইতে মহীর পৃথিবীর বা মৃত্তিকার উৎপত্তি বা স্বষ্টি হয়।

তাই লিখি, তুমি 'সন্ন্যাসী' হইতে পারিলে সন্ন্যাস দিবার জন্য সন্ন্যাসী চিনিবার বাকী থাকিবে না।

১৩৩০। ৩রা চৈত্র।
গৌরী-আশ্রম। } আঃ ভারত

শ্রীমতী পূর্ণশশী দত্তরায়—কাঁঠালতলী।

মা, তোমাদের সংসারের অভাব অনটন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে বিধায় বোধ হয়, অনেক সময় অধৈর্য্যভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, এমন সময়ে উপদেশ দেওয়াও কঠিন হইয়া পড়ে। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে কিছু লিখিতেছি, গ্রহণ করিও।

শ্রীভগবান তাঁহার প্রিয় ভক্তকে কৃপা করিয়া দেবদুর্লভ অহৈতুকী ভক্তি দান করিবার জন্য ভক্তির ব্যাঘাত স্বরূপ দৈহিক ও মানসিক সুখ দুঃখ জনিত হেতু দূর করিবার অভিপ্রায়ে রোগ শোক ও দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। যে ভক্ত এই দুঃখ যন্ত্রণাগুলিকে তাঁহার দান বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহার আর কোনকালে দুঃখ থাকে না, এবং শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার পিতৃলোকও মুক্তিলাভ করেন।

অতএব লিখি, তোমাদের বর্ত্তমানে যে সকল অভাব অনটন আসিয়া পড়িতেছে, ইহাতে অধীর হইও না। সর্ব্বদাই মায়ের নিকট প্রার্থনা করিও যে—"মা, তোমার সেবা পূজার উপায় কর যাহাতে চিরকাল তোমার সেবা করিয়া জনম সফল

করিতে পারি।" আর মনে রাখিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যাহারা ভগবদ্ভক্ত ছিলেন তাঁহারা সকলেই এই দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়াই শ্রীভগবানের কৃপা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আর শ্রীমতী শান্তিকে বলিবা, সে যেন খুব প্রার্থনা করে, বিশেষ কথা এই যে, সৎপতি লাভের জন্য কুমারী মেয়েদের সাধন ভজন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে কোন লজ্জার কারণ নাই।

তোমার হাতে ঘা হইয়াছে, তাহা আরোগ্যের জন্য তিন মাসের মধ্যে এক লক্ষ ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিতে হইবে। ইহা তোমার ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

১৩৩০।২৮।১২ আঃ
গৌরী-আশ্রম। ভারত

জনৈক ভক্তের নিকট—

তোমার পত্র পাইলাম। লিখিয়াছ—জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদ কি? অথবা পরমাত্মা বা জীবাত্মায় প্রভেদ কি? বন্ধন ও মুক্তি কি?

জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদ রূপ সন্দেহ নিবৃত্তিই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। তোমারই বন্ধন তোমারই মুক্তি। তুমি স্থূলে আসিয়া সূক্ষ্মতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা তোমার মনে নাই। অভিমন্যুর মত এই দেহরূপ ব্যূহে

প্রবেশ শিখিয়াছ, বাহির হইবার কৌশল জান না। তাই তোমার দুর্ব্বোধ্য কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু লইয়া সংগ্রামে তোমাকে জর্জ্জরিত করিতেছে। তুমি নিজকে সামলাইতে পার না, এই সুখ দুঃখের তাড়নায় অস্থির, তাই তোমার বন্ধন। একটা চৈতন্য অবস্থা অর্থাৎ সুষুপ্তি বা নিদ্রার পর যে চৈতন্য হইল, এই চৈতন্যেরই ভাব। এই চৈতন্য আর মহদ্ভাব অর্থাৎ এই যে 'আমি তুমি' বিরহিত যে ভাব সেই পর্য্যন্ত কারণ-দেহ। জীবন্মুক্ত মনীষীগণ এই কারণ-দেহে থাকিয়া পার্থিব বিষয় ভোগ করিতে পারেন বলিয়া, অথবা ইহার অতীত অবস্থায় গতি আছে বলিয়া বন্ধন নাই। এই তত্ত্ব দীক্ষার সময় তোমাকে ব্রহ্মগায়ত্রী ও অজপা গায়ত্রী দ্বারা সাধারণভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি। আবার বলি, ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থ—যেমন পরমাত্মা বলিয়া জানি এবং পরতত্ত্ব বলিয়া ধ্যান করি, সেই ভাব অর্থাৎ এই পরমভাব বা ব্রহ্মভাব আমাতে হউক বা প্রেরণ কর। এই ভাব বা অবস্থা লাভ করিতে হইলে, তোমার স্থির হইতে হইবে। অর্থাৎ এই অবস্থা জানিতে গেলে অন্তর্ম্মুখী হইতে হয় এবং তৎসঙ্গে স্থির অবস্থা আপনি আসে। মুক্তি বা বাহির হইবার কৌশল তোমাকে বলিয়াছি, তোমার মনে নাই। আবার বলিতেছি, তোমার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিনটি দেহ, ইহার অতীতে যাহা তাহাই তুমি, ইহা তোমার মুক্তাবস্থা, ইহাই তোমার পরমাত্মাবস্থা অর্থাৎ প্রকৃত নিজ অবস্থা, তাই পরমাত্মা বলে।

এই যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে স্থূল দেহ, ইহাতে তুমি হংস

বাহনে আছ। তুমি তোমার অহংকারকে (অহংতত্ত্বকে) আশ্রয় করিয়া মনের সাহায্যে নানা ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাক, ইহাই তোমার সূক্ষ্ম দেহ। তারপর এই কারণ-দেহ জানিতে হইলে স্থিরচিত্তভাবে বুঝিতে হয় অহংতত্ত্বের স্বরূপ 'আমি' জ্ঞান, এই আমিকে বুঝিতে হইলে আমি জ্ঞান, দূর হইয়া একটা স্থিরভাব আসে, এই স্থিরভাবে 'আমি' 'তুমি' থাকে না, একটা ভাব থাকে মাত্র—ইহাকেই মহদবস্থা বা মহৎভাবও বলাযায়, এইজন্য ইহাকে মহত্তত্ত্ব বলে। তারপর আরও স্থির হইতে পারিলে ভাবও থাকেনা—কিন্তু এই স্থিরাবস্থা নিদ্রাতেও হয়, ইহা তোমার আমার অজ্ঞাতসারে হইয়া যায়। এই যে স্থির হয়, কেবল অহংতত্ত্বে ডুবিয়া থাকে, ইহাকে সুষুপ্তি বা সুনিদ্রা বলে। অহংতত্ত্বে ডুবিয়া থাকে, বিধায় প্রাণবায়ু অবলম্বনে আছে—স্থির হয় না, কারণ নিদ্রিতাবস্থায় সূক্ষ্মদেহ ছাড়াইতে পারে না, তাই অজপা বন্ধ হয় না। উপাসনা প্রভাবে জ্ঞাতসারে মন স্থির করিলে, সূক্ষ্মদেহে অতীত হইলে, অজপা বন্ধ হইয়া যায় এবং কারণ-দেহের অবস্থা অবগত হওয়া যায়। মোটকথা এই সময়ে চৈতন্য থাকে বলিয়া চৈতন্য-সমাধি বলে। তারপর তুরীয় বা তুরীয়াতীত অবস্থা, ইহা বলিবার নয়।

একেকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া কেহ পঞ্চকোষ বলে যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। অন্নের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় তাহাই অন্নময় কোষ। প্রাণের দ্বারা অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সাহায্যে আছ বলিয়া অর্থাৎ যতক্ষণ

থাক—অর্থাৎ প্রাণবায়ুই প্রাণময় কোষ। প্রাণবায়ুর অতীত অর্থাৎ প্রাণবায়ু হইতে পৃথক হইয়া মনের আশ্রয়ে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারে, যেমন স্বপ্নাবস্থায় প্রাণবায়ু থাকিলেও তুমি যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পার, ইহাই মনোময় কোষ। এই অহংতত্ত্ব অতিক্রম করিবার সময় জাগ্রতাবস্থায় এই নিদ্রার মত ভুল হয় বা ভ্রম অবস্থার পর জ্ঞান হয় অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাবস্থা হয়। পূর্ব্বোক্তোবস্থায় আমি জ্ঞান বিরহিত মহাভাব হয়, ইহাকেই কারণ দেহের অন্তর্গত জ্ঞানময়কোষ বা চিন্ময়াবস্থা বলে, অর্থাৎ খাঁটি চৈতন্যাবস্থা। চৈতন্যদেব এই অবস্থা জানিয়া জগৎকে বা সকলকে বুঝাইয়াছেন বলিয়া ভারতী গোঁসাই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম রাখিয়াছিলেন। এই জ্ঞানময় কোষের পর বিজ্ঞানময় কোষ—এই তোমার মুক্তির সোপান। উপাসনা প্রভাবে তোমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার নাম মুক্তি।

শুন, এই গুহ্য কথা চিঠিপত্র দ্বারা বুঝান যায় না, মুখে বলিলেও শ্রোতা শমদমাদি গুণযুক্ত না হইলে বা অহংতত্ত্ব অতিক্রম করিবার শক্তি না জন্মিলে, বুঝাইলেও বোধগম্য হয় না। তাই লিখি—উপাসনা কর, উপাসনা প্রভাবে নিজেই অনুভব করিতে পারিবে। ঋষিগণ কাজ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন—পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কুণ্ডলিনী শক্তি এই ক্রিয়া দ্বারা জাগিবেন। কোন চিন্তা করিও না। বাহিরের প্রতিমা পূজা দ্বারা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর উপাসনা করিতে হয়। ভিতরে যেমন চিন্ময়রূপী—বাহিরেও "স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরং" ব্যাপিয়া চিন্ময় অবস্থায় আছেন,

অথবা চরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তোমাতেও আছেন—অথবা এই চরাচর ব্যাপি চিন্ময়ীমার কলা তুমি বল কিম্বা রামকৃষ্ণাদি অবতারই বল, তাঁহারই এককণা। তাঁহাকেই উপাসনা দ্বারা অমূল্য ভক্তির সহিত ভালবাসিতে পারিলে দয়া করিয়া তাঁহার কোলে তুলিয়া লন। এই বাহিরের উপাসনা অত্যাবশ্যকীয়। খুব প্রার্থনা করিবা—প্রার্থনা সাধনামূলং। আর বিশেষ কি লিখিব। আমি আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত আশ্রমে আছি ; পরে নেত্রকোণা হইয়া তোমাদের তথায় যাইতে পারিব। ইতি—

১৩২৯।১৪।৪ গৌরী-আশ্রম। } আঃ ভারত।

জনৈক ভক্তের নিকট—

শ্রীশ্রীতারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ ব্যাপারে যোগ দিতে লিখিয়াছ, আমিও বুঝিতেছি যে, সত্যধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবেই এবং তদনুয়ায়ী সত্যাগ্রহেও প্রাণপণে যোগ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ময়মনসিংহ কংগ্রেস হইতেও একখানা চিঠি আসিয়াছিল। কিন্তু এখনও মা আমাকে যোগ দিতে বলিতেছেন না বিধায় তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় আছি। মায়ের ইচ্ছা ব্যতীত আমি নিজে কিছুই করিতে পারি না।

কোন চিন্তা করিও না, ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপেই কলি নিগ্রহ হইবে। বিশেষতঃ ধর্ম্মমন্দিরগুলি আমাদের

আদর্শ স্থল—মানুষ তৈয়ার করিবার কারখানা। এগুলির সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত সমাজের উন্নতির আশা নাই। সমাজ উন্নত হইলেই গঠন কার্য্য ভালরূপ চলিবে। অতএব এই মহৎ কার্য্যে যোগদান করা..................

১৩৩১।১২।৩ আঃ ভারত।

শ্রীমান্ ভাস্করানন্দ চক্রবর্ত্তী—কলমাকান্দা।

তোমার পত্রখানিতে শুভ সংবাদ পাইয়া খুব সুখী হইলাম। মা যে কৃপা করিয়া মানবীয়রূপে—তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আসিবেন ইহা বড়ই আনন্দের কথা। সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে অধীনা হইয়া আশ্রয় দিয়াছেন, ইহাকেই তোমরা বিবাহবন্ধন বলিয়া থাক। বিবাহ অর্থে অধীনা, আশ্রিতের জীবনের সম্পূর্ণ ভার অঙ্গীকার করিয়া গ্রহণ করা বুঝায়।

এই যে তোমরা মাতৃমূর্ত্তিতে অকর্ত্তৃত্বের লক্ষণ, অধীনা, আশ্রিতা, অবলার ভাব দেখিতেছ ইহাই পরাপ্রকৃতির ধর্ম্ম। মানুষ মাত্রেরই নিজকে এইরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সোহহং জ্ঞানে নির্লিপ্ত অকর্ত্তা জানিতে হইবে। এই জন্যই মাতৃজাতি তোমাদের আদর্শরূপে গ্রহণীয়। তাই লিখি, পূর্ব্বোক্ত দৃষ্ট ভ্রান্ত বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক মায়ের করুণা স্মরণ করিয়া, তাঁহারই দান জানিয়া আদর্শরূপে গ্রহণ করিও; অথচ সতীর সতীত্ব

রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিও। মা মহাশক্তির অংশ সম্ভূতা পতিব্রতা সতীসঙ্গিনী হইলে পুরুষের কোন বিপদ আশঙ্কা থাকিতে পারে না।

পুরাণাদি আলোচনা করিয়াও জানা যায় যে সহধর্ম্মিণী প্রভাবে কেহ কেহ ঘোর বিপদ হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন। আর কেহ কেহ সহধর্ম্মিণীর অভাবে নানা প্রকার লাঞ্ছনাও ভোগ করিয়াছেন। তবে কথা এই যে, পূর্ব্বে ছেলে মেয়েদের উপাসনা প্রভাবে ভগবৎ আদেশ অনুযায়ী মিলন হইত। এখন সে সময় নাই। কাজেই তোমাদের ইহাই ভগবৎ ঈঙ্গিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতেও কিছু আসে যায় না। জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চেষ্টা কর। আত্ম-সমর্পণ ভাব বলবতী হউক, কোন চিন্তা নাই।

সতীর সতীত্ব রক্ষার হেতু কি জান? তাহাদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়ার জন্য লালন পালন ও তাড়না করিবে কিন্তু কোন প্রকার অসৎ ব্যবহার করিবে না। বিবাহ বলিতে একটি বিলাসের জিনিষ গ্রহণ করা বুঝায় না। জগতের কোন মঙ্গলের জন্য যে কয়টি সন্তান হইবে, কোন তারিখে তাহাদের গর্ভাধান হইল, তাহা মাতাপিতার বিশেষরূপ জ্ঞাত থাকা চাই। নচেৎ সৃষ্টি রক্ষার ভান করিয়া অযথা—জনিত কুব্যবহার করিলে সতীর সতীত্বের শক্তি হ্রাস হেতু লক্ষ্মীনাশ হইয়া ধন হানি, দৈহিক রোগ, পীড়া, মনস্তাপাদি এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ জনিত জ্বালা যন্ত্রণা ভুগিতে হয়।

১৩৩১।৩০।৩ } আঃ
চিত্রধাম। } ভারত।

জনৈক জিজ্ঞাসুকে—সিংরৈল

শিবলিঙ্গ ব্রহ্মচৈতন্য বা ঈশ্বরের প্রতীক। ইহাই ব্রহ্মের কারণ-দেহ। যেমন জননীর সৃষ্টি-পথে পুং চিহ্ন বিশিষ্ট সন্তান প্রসব হয়, তদ্রূপ শিবলিঙ্গ প্রতীকে গৌরীপীঠ—ব্রহ্মযোনি বিশ্বের জননী স্বরূপা, আর পুংলিঙ্গ চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরের প্রকাশ।

ঈশ্বর ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই ত্রিশক্তি সম্পন্ন। ঈশ্বরের ইচ্ছা—"বহু স্যাম" বহু হইব, অর্থাৎ জগৎরূপে প্রকাশিত হইব—এই জগতই সৃষ্টি লয়াদি ক্রিয়াযুক্ত ঈশ্বরের গার্হস্থ্যাশ্রম। এই ইচ্ছা কামনা নয়, যেহেতু ইহাতে তাঁহার দুঃখ নাই; অতএব সৃষ্ট জগৎ তাঁহার খেলা বা লীলামাত্র।

সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের সৃষ্টি লয়াদি ক্রিয়ারূপ খেলার ন্যায় মুক্তপুরুষের গার্হস্থ্যাশ্রমও খেলা মাত্র।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৈবকী স্বরূপা মহাশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া নন্দরাণীর গৃহে থাকিয়া ব্রজে লয় ও পালনরূপ বাল্যলীলা সম্পাদনান্তে কালক্রমে দ্বারকায় গমন করতঃ তথায় রাজা হইয়া পরার্থে অথাৎ বহুসংখ্যক রমণীর বাসনা পূরণার্থ তাঁহাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। ইহাদের বহুসংখ্যক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট জগৎ। তারপর লীলা অন্তে প্রভাসক্ষেত্রে স্ববংশ নির্ম্মূল করিলেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অভিশাপরূপ বাসনাকে উপলক্ষ করিয়া তদীয় সৃষ্ট জগৎ (৫৬ কোটি যদুবংশ) ধ্বংস করতঃ প্রলয় ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

আঃ

ভারত।

শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—লক্ষ্মীয়া।

কোন ব্যক্তি বিশেষকে সত্য বিষয়ে আদেশ বা উপদেশ দিবার প্রয়োজন হইলে, তাহার উন্নতিকল্পে, সত্য কথায় কার্য্যে অনুরক্ত করিবার জন্য যে নিশ্চয়াত্মিকা বাক্য আসিবে তাহা কর্ত্তৃত্বাভিমান জনক হইলেও ইহাকে অহংকার বলা যায় না; কেননা উহা সত্য বাক্য,—তাহারই মঙ্গলার্থে। ইহা সৎস্বভাবা প্রকৃতির ধর্ম্ম। আর অসত্য, অকারণে এবং যথা তথা প্রকাশ করিলে ইহাকে অহংকার বলে, অথচ ইহাই অসাধুতা। স্থল বিশেষে কার্য্য ভেদে সত্য গোপন করিলেও অসাধুতা। স্থল বিশেষে কার্য্য ভেদে, সত্য গোপন করিলেও অসাধুতা প্রকাশ পায়। তবে ইহা অন্যের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হইলে ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে বলিয়া, অহংকার ভাবিয়া লওয়া উচিত হইবে না। *

কাওরাইদ।
১৩৩১ সন। } ভারত।

---

* পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীবাবা হৃষীকেশে যোগানন্দকে যে চিঠি দেন, তাহাতে তাহাকে সাধনায় নিবিষ্ট করাইবার জন্য আবশ্যকমত উপদেশ প্রদান করিয়া লিখিয়াছিলেন—"যদি বুঝিতে ভ্রম হয়, তবে স্থানে স্থানে মৎস্বরূপ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের নিকট জানিয়া লইলেও ভাল।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় ত্রিকালজ্ঞ শব্দের প্রতিবাদ করায় এই পত্র লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীমান্ সুধীরানন্দ—চিত্রধাম।

আমরা কাওরাইদ হইতে (২৪শে শ্রাবণ, ১৩৩১) রওনা হইয়া গ্রহণ উপলক্ষে ৺কাশীধামে ২ দিন বাস করিয়া শ্রীশ্রী৺বাবার অযাচিত কৃপা পাইলাম। তারপর প্রয়াগধামে ত্রিবেণী স্নান করিয়া ২রা ভাদ্র বেলা প্রায় ১২ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামের রজপ্রাপ্ত হইয়া ২দিন ধর্ম্মশালায় বিশ্রামের জন্য থাকিতে হইল। ৪ঠা তারিখ বেলবনে শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীমায়ের শ্রীপাদপদ্মে স্থান পাইলাম। বেলবন শ্রীশ্রীযমুনা মায়ের পূর্ব্বতীরে হইলেও মথুরা দিয়া যমুনা পার হইয়া বেলবন প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধান। স্থলটি অতি নির্জ্জন ও শান্তিপূর্ণ। আসিয়া মায়ের কৃপার আভাস পাইলাম সত্য, কিন্তু মায়ের সম্পূর্ণ কৃপা পাইতে বোধ হয় অনেকদিন লাগিবে। এখানে চিঠিপত্রাদির যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা বিধায় বৃন্দাবনে নিম্নলিখিত ব্রজবাসী পাণ্ডার বাড়ী নির্দ্দিষ্ট রাখিলাম। কয়েক দিন যাবৎ শ্রীমান্ গোবিন্দ ও শ্রীমতী কুমুদিনীর জ্বর হইয়া শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছে, ইহাও মায়ের আদেশ মতই হইয়াছে, কোন চিন্তা করিবা না। আমার ও বুকে আনাহ হইয়াছিল, এখন খুব কম আছে।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমান্ শঙ্কর ও হেমচন্দ্র আশ্রমে আছে কিনা জানাইবা। শ্রীমতী বনবাসী, নির্ম্মলা ও শ্রীমান্ গোপালকে মধুমাখা শাসন করিয়া চালাইও। শ্রীমান্ শঙ্করানন্দ আশ্রমে থাকিলে তাহাকে বলিও যে, বিশেষ দরকার ব্যতীত যেন এই আশ্রম ছাড়িয়া অন্যত্র না যায়। তাহাকে ভিক্ষার জন্য

টাউনে দিবা না। আর সকলেই উপাসনা ও প্রার্থনাদি করিবা। আমাদের খরচ পত্র না থাকায় পাণ্ডার নিকট হইতে ৭৲ সাত টাকা হাওলাত লইয়াছি। বোধ হয় আগামী কল্য আরও কিছু লইতে হইবে, কারণ এখানে ভিক্ষার একান্ত অসুবিধা। নিকটে একটি গ্রাম আছে, ১৫।২০ ঘরের বসতি, মাধুকরী মিলে না। টাউন ও পূর্ব্বপারে প্রায় একক্রোশ তফাৎ, যাতায়াতে চারি পয়সা গোদারা লাগে। সওদাপাতি ওপারে যাইয়া আনিতে হয়। এপারে কিছুই খরিদ করিতে মিলে না। আমি লক্ষ্মণপুর একখানা চিঠি দিয়াছি, খরচের জন্যও কিছু সাহায্য চাহিয়াছি। রোজ একটি টাকার কমে খরচ চলে না। ধীরানন্দের টাকা রাস্তাতেই খরচ হইয়াছে। এই চিঠিখানা লইয়া হেমচন্দ্রের সাহায্যে চেষ্টা করিয়া যদি কিছু পাঠাও তবে এখানের কাজ চলিতে পারে, নচেৎ বিশেষ অসুবিধা। ২।১ দিনের জন্য ঠেকা হয় না, আর কেবল সেবার কাজ হইলে কোন চিন্তা ছিল না। কার্য্যটি বৃহৎ, তাই লিখিতে হইতেছে! মায়ের আগমনের আভাস পাইতেছি, কিন্তু কবে হবে তাহা এখনও বলিতেছেন না। কতদিন লাগিবে তাহা এখনও বলা যায় না। আমার বিশ্বাস এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রায় দেড়শত টাকার দরকার। এখন দেশে আমদানীর সময়, সকলের কাছেই চাহিতে হইবে এবং ইচ্ছা করিলে সকলেই কিছু কিছু দিতে পারিবে। যাহা হউক, মায়ের নিকট সকলেই খুব প্রার্থনা করিও। আর হেমচন্দ্র যেন এই মহৎ কার্য্যের জন্য স্থানে স্থানে চেষ্টা করিতে

ত্রুটি না করে। তাহাকে রাখিয়া আসিবারও বিশেষ উদ্দেশ্যই এই।

আর একটি কথা এই যে, তোমার ঠাকুরহুহুর কথা পালন করিও। তিনি আমাদের মূল, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবা। আর তাঁহার অতিরিক্ত শাসন হইলেও হাসিমুখে সকলেই সহ্য করিও।

আর বিশেষ কি লিখিব। শ্রীমান্ শঙ্করানন্দ আশ্রমে থাকিলে কোন চিন্তার কারণ মনে করি না। পত্র পাঠ উত্তর লিখিও এবং যখন যাহা হয় তাহাও জানাইও। অন্যান্য আশ্রমবাসীদিগকে আপ্যায়িত করিও।

পুঃ—হেমচন্দ্র যেন প্রথমে উপেন্দ্রবাবুর নিকট যাইয়া কয়েকখানা বই লইয়া তাহার পরামর্শ মত চলে। ইতি—

বেলবন।

১৩৩১।১১।৫

আমি মায়ের আদেশে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধাম বেলবনে আছি। এখানে শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মায়ের বাড়ী ; তাঁহারই কৃপা ভিখারী হইয়া চরণতলে পড়িয়া আছি। যতদিন মা কৃপাদান না করেন ততদিন এখানে থাকিতে হইবে। রাজলক্ষ্মী জগজ্জননীর করুণা ভিন্ন 'জগতের" মঙ্গল সাধন হইতে পারে না, তাই তাঁহার আদেশ অনুসারে বৃহৎ কার্য্যে ব্রতী হইলাম। বর্ত্তমানে আমি যে স্থানে আছি, সে স্থানটি অরণ্যময় বলিয়া সেবাদি খরচের যোগাড় ভিক্ষা করিয়া চলে না। অতএব

আমাদের নিজেদের নিকট জানানো কর্ত্তব্য বিধায় অন্ত এই লিখন খানা পাঠাইলাম। টাকা পয়সা আমাকে সকলেই দিয়াছ, এবং কত টাকা কত রকমে অপব্যয় হইয়া থাকে। এবার আমার এই কার্য্যেও তোমরা যথাসম্ভব সাহায্য করিতে অমত করিও না। আর আমার বিশেষ কথা এই যে, নিজেদের লোক ভিন্ন অন্যে জানিলে বিশ্বাস না-ও করিতে পারে; তাই অন্যের নিকট যেন গোপন থাকে। বর্ত্তমানে পাণ্ডার নিকট হইতে হাওলাত করিয়াছি। এই চিঠিখানা সকলকেই দেখাইতে হইবে।

১৩৬১।১৩।৫
শ্রীবৃন্দাবনধাম, বেলবন। } আঃ
ভারত।

শ্রীমান ইন্দুভুষণ ব্রহ্মচারী

আমি আশ্রমে আসিয়া শারিরীক অস্বুস্থতা বশতঃ কোন স্থানে চিঠি পত্রাদি লিখিতে পারি নাই এবং উৎসবেতে নিমন্ত্রণ ও করি নাই। ইচ্ছা এই যে, কোন মতে মায়ের কাজ সম্পাদন মাত্র হউক, এ জন্য তোমরা মনে কিছু ভাবিও না। পূজার তিন দিন আমার অসুখ এত বাড়িয়া ছিল যে, এ তিন দিনের কোন খবর রাখি নাই। যাহা হউক এখন ভাল, কেবল দুর্ব্বল। শ্রীমান্ যোগানন্দের কোন সংবাদ পাই নাই, কেবল তোমার মণিঅর্ডার পাইয়া, যোগদার দেওয়া

নয় টাকা শ্রীমান্ উপেন্দ্র বাবুর নিকট পাঠাইয়া, তোমার একটাকা রাখিলাম ; উপেন্দ্র খুব বিপন্নাবস্থায় আছে, যোগ-দাকে জানাইবা যাহাতে তাহাকে টাকা দিয়া সাহায্য করিতে পারে। কুমুদকে ও শঙ্করকে বই বিক্রির জন্য গ্রামে গ্রামে সকলের সঙ্গে দেখা করিতে পাঠাইলাম।

৩১।২।৭ চিত্রধাম-আশ্রম। } আঃ ভারত।

সিদ্ধাশ্রমের ব্রতচারী সন্ন্যাসীগণের নিকট

তত্ত্বমস্যাদি—তত্ত্বমসি+আদি অর্থাৎ তত্ত্বমসি ইত্যাদি। তত্ত্বমসি—ত্বৎ (তাহাই) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও)।

মহাবাক্য—প্রাচীনকালে তত্ত্ববিদ্গণ মুমুক্ষুদিগকে স্বস্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্য আত্মজ্ঞান বোধক যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—তাহাই মহাবাক্য। চারিটি মহাবাক্য প্রচারিত আছে—তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মস্মি, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব তত্ত্বমসি কথাটা তস্য (তাঁহার) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও) অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তুমি সেই ও তুমি তাঁহার অর্থাৎ আমি সেই বা আমি তাঁহার এই উভয় বাক্যের কোন্ সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত ইহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া সিদ্ধাশ্রমের ব্রতাচারী সন্ন্যাসীগণ শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রশ্ন করেন। তাহারই উত্তর।

স্বগত ভেদ তিন প্রকার—স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়। এক বস্তুর পৃথক পৃথক অংশে যে প্রভেদ তাহা স্বগত, মানুষের হাত পা চুল নখ মুখ মাথা বুক চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক ইত্যাদিতে পরস্পরের প্রভেদকে স্বগতভেদ বলে। এক জাতীয় পৃথক পৃথক বস্তুর যে প্রভেদ তাহার নাম স্বজাতীয় প্রভেদ। রাম, শ্যাম, যদু, মধু ইত্যাদি বহু মানুষের মধ্যে পরস্পর যে প্রভেদ তাহাই স্বজাতীয়। পৃথক পৃথক জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর যে প্রভেদ তাহা বিজাতীয় প্রভেদ। মানুষ, পশু, বৃক্ষ, পক্ষী, জল ও অগ্নি প্রভৃতিতে যে প্রভেদ তাহাই বিজাতীয়।

আমি সেই—এখানে 'আমি' অর্থে জীব, 'সেই' অর্থে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ; জীবের এই অনুভূতি নাই। তত্ত্বজ্ঞের নিকট এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনন ও নিধিধ্যাসন (ধ্যান) করতঃ তাহা উপলব্ধি করিবেন। ব্রহ্ম জীব একরূপ পদার্থ হইলেও জীব মায়ার ফেরে পড়িয়া ভ্রম বশতঃ আমি (দেহ আমি) অভিমানে আপনার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে। আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক অর্থাৎ স্বজাতীয় বা বিজাতীয় প্রভেদ যুক্ত বলিয়া ভ্রম করিতেছে ; এই ভ্রম দূর করিবার জন্যই সেই আমি মনন। ব্রহ্ম অখণ্ড তাহাতে অংশ সম্ভবে না, সুতরাং ব্রহ্মে স্বগত প্রভেদ নাই। জীব তাঁহার সহিত স্বগত প্রভেদ আমি অভিমানে দৃষ্টতঃ উপলব্ধি করে মাত্র।

আমি তাঁহার—আমি অর্থে জীব, তাঁহার অর্থে ব্রহ্মের

অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অংশ। এখানেও জীবের আমি অভিমান—তাহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক রাখিতেছে। এই দৃষ্টতঃ প্রভেদ-বোধ জীবের—ব্রহ্মের নহে।

আমি সেই, আমি তাঁহার—এই উভয় ভাবনাই আমি (জীব) সেই তিনি (ব্রহ্ম) হইতে দৃষ্টতঃ ভিন্ন অনুভূত হয়। আমি অপূর্ণ, ব্রহ্ম পূর্ণ, আমি অংশ, ব্রহ্ম ভূমা, আমি সদ্বিতীয়, ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, আমি জলবিন্দু, ব্রহ্ম সাগর, আমি অগ্নিকণা, ব্রহ্ম সূর্য্য, আমি ঘটাকাশ, ব্রহ্মমহাকাশ—আমি পত্র বা ফুল, ব্রহ্ম বৃক্ষ—এইরূপ অনুভূতি থাকে।

যতক্ষণ অহং বোধ থাকে ততক্ষণ ত্বং বোধও আছে ; যখন অহংবোধ লোপ পায় তখন ত্বং বোধও থাকে না। সেই ভাবই অদ্বৈতভাব বা সোহহংভাব। এই অবস্থায় না পৌঁছিলে তাহা বুঝা যায় না, অন্যকে বলিয়া প্রকাশ করা যায় না—এই অবস্থা ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া ইহা চিন্তা ও মনন করাও যায় না। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে এই অদ্বৈত ভাবের অপরোক্ষানুভূতি হয়। সচ্চিদানন্দ সাগরে যিনি এইরূপ দুই এক ডুব দিয়াছেন, তাঁহাকে তত্ত্ববিদ্ বা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা যায়।

ব্রহ্মের সগুণ ভাবই প্রকৃতি (ত্রিগুণময়ী পরাপ্রকৃতি)। প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্বের প্রকাশ। সুতরাং সাধক অহংতত্ত্বে থাকিয়া বুদ্ধিতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। পরাপ্রকৃতি বা ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি ত আরও দূরের কথা। আবার বিচার দ্বারা বুদ্ধিতত্ত্ব পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায়, তারপর আর বিচার চলে না, তখন প্রকৃতির হাতে

আত্মসমর্পণ ব্যতীত সাধকের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

যিনি একত্বে (অদ্বৈতভাবে) পৌঁছিয়া স্থিতিলাভ বা মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি অভ্রান্ত (পূর্ণজ্ঞানী) হওয়ায় যে কোন বাক্য, যে কোন শাস্ত্র, যে কোন মতের সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ হয় না। তিনি কোন বাক্য মত বা শাস্ত্র খণ্ডন করেন না, শুধু সেই সমস্ত বাক্যাদির যথাযথ সদর্থ প্রচার করিয়া মীমাংসা ও সামঞ্জস্য বিধান করেন।

অদ্বৈতভাবে পৌঁছিয়া ও স্থিতিলাভ করিতে অর্থাৎ দ্রষ্টা (লীলাদর্শক) হইতে না পারিলে ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। যাবৎ ভ্রম থাকে তাবৎ দেহাত্মবোধ জনিত বাসনার ফলে কর্ম্মফল (জন্ম মরণ সুখ দুঃখ) ভোগ হইতে নিস্তার নাই, সুতরাং অন্যে কি করিল না করিল, অন্যের পথ সরল বা বক্র এসব সমস্যার মীমাংসায় কালক্ষয় না করিয়া স্থিরভাবে লক্ষ্যের দিকে অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্ব লাভের জন্য প্রাণপণ যত্ন করা আবশ্যক। খরগোশের ন্যায় পথে না ঘুমাইয়া, পথি পার্শ্বস্থ বস্তু সকলের তামাসা না দেখিয়া, কচ্ছপের মত আস্তে আস্তে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে হইবে, পরে যত ইচ্ছা ঘুমাইলেও ক্ষতি হইবে না।

১৩৩১। ১৭ই কার্ত্তিক। } আঃ ভারত

শ্রীমান্ শচীন্দ্র চন্দ্র রায়—লক্ষ্মীগঞ্জ।

শ্রীমান্ শচীন্, আমি জানিতে পারিলাম যে, তুমি নাকি পরশুরাম হইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পালন করিতে চাহিয়াছিলে। তিনিও ত ইহা নিজে ইচ্ছা করিয়া করেন নাই, তাঁহার পিতৃবাক্য পালনার্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আবার হাতে কুড়াল আটকায়াছিল বলিয়া মাতৃবধ-জনিত পাপক্ষয়ার্থ তাঁহাকে কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছিল। কেমন? এই কি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম? পরে বোধহয় তাঁহার পরিতাপও হইয়াছিল।

ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম ইহা নহে। ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক মনের দুষ্কৃতিগুলিকে দূর করিয়া দিয়া স্বধর্ম্ম (আত্মধর্ম্ম) পালন করার নাম ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম। আমি বলি, আগে নিজ রাজ্য স্বাধীন কর, ধর্ম্ম সংস্থাপন কর, পরে বরং অন্যের রাজ্য শাসন করিতে পারিবে। তুমি কাহাকে নিয়া অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে চাও? তোমার মন্ত্রী ও সেনাপতি তোমার বশবর্ত্তী নয়, খুব মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া দেখিও। যদি বল মা তোমা দ্বারা করাইতেছেন, তুমি নিজে কিছু কর না, সদসৎ তাঁহারই কার্য্য, তিনি কর্ত্তা, জীবে কিছু করিতে পারে না ইত্যাদি, ইহা তোমার ভ্রান্তি। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, জীব কামনা বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া কুপ্রবৃত্তির ফলে অসৎ কার্য্য করিয়া থাকে। মা কিন্তু অশুভ ফল ইচ্ছা করিয়া দেন না, তাই অসৎকার্য্য জীবের বাসনানুযায়ী জানিবা। কেবল "যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি" বলিলেই হইবে না। যেমন জ্ঞানও তিনি অজ্ঞানও তিনি, সেইরূপ এতদুভয়ের অতীত ও তিনি। তদ্রূপ তুমি

জ্ঞানও ছাড় অজ্ঞানও ছাড়—তদ্‌গত হও—জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত হও—'সেই' হও।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া স্মৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগসঃ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূদ্রের কাজ ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করা, ব্রাহ্মণও তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বীজ প্রদান করিবেন। বীজ সংগ্রহ হইলে সাধক তাহা দেহরূপ জমিতে বপন করিবে, এবং অধ্যাত্ম ক্রিয়া দ্বারা তদ্বির করিয়া ফসল উৎপাদন করিবে; ইহাই বশ্যোচিত কর্ম্ম। তারপর দুষ্টদমন শিষ্টপালন করিয়া দেহ-রাজ্যে ধর্ম্মসংস্থাপন কর। ইহাই ক্ষত্রিয়ত্ব। তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার দর্শন বা বাক্য দ্বারা তাঁহার লীলার সহচর হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়।

বৈরাটী। আঃ ভারত।

সিদ্ধাশ্রমের সন্ন্যাসীদের নিকট—

দ্রষ্টার আত্মসমর্পণ ও আত্মসর্পণকারীর দ্রষ্টৃত্ব। আত্মজ্ঞানলাভে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও ঈশ্বরোপাসনায় আত্মজ্ঞানলাভ (চৈতন্য সত্ত্বায় স্থিতি)—যেহেতু চৈতন্যসত্ত্বা-অকর্ত্তা। প্রকৃতি হ্লাদিন্যাভিমানী শক্তি প্রকাশে সৃষ্টিলয়াদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন, অর্থাৎ চৈতন্য-সত্ত্বা প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। জীবাত্মার আত্মসমর্পণই আত্মজ্ঞান বা চৈতন্য-

স্বরূপত্ব প্রাপ্তহওয়া। কর্ত্তৃত্বাভিমানই জীবত্ব। পরমাত্মা কর্ত্তৃত্ববিহীন কর্ত্তা। জীবাত্মার কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকাতেই সুখ দুঃখ ভোগ করে। কর্তৃত্বাভিমান দেহাত্মবোধে ঘটে। অতএব তাহাকে বদ্ধজীব বলে।

পরাপ্রকৃতির ষড়ৈশ্বর্য্যের বিকাশই ঈশ্বরত্ব, আর জীবত্মা বা অপরা প্রকৃতির আত্মসমর্পণই চৈতন্য বা আত্মজ্ঞান। পরা-প্রকৃতি ও চৈতন্য অভেদ হইলেও কি এক অজানা ইঙ্গিতে যেমন কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষে ষড়ৈশ্বর্য্যের বিকাশে ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পায়, আর কাহারও মধ্যে প্রকাশ পায় না। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, ঈশ্বরত্ব বা ষড়ৈশ্বর্য্যের বিকাশ পরাপ্রকৃতির বিশেষ ইচ্ছার অধীন। জীবাত্মা বা অপরাপ্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপত্ব (আত্ম স্বরূপত্ব) প্রাপ্ত হইলে, পরাপ্রকৃতিগত হয়, অর্থাৎ তাঁহাকে কর্ত্তা মানিয়া অকর্ত্তা হয়। ইহাকেই বেদান্তে তত্ত্বজ্ঞানলাভ এবং পুরাণে আত্মমর্পণ বলিয়া থাকে।

চিত্রধাম। } আঃ
১৩৩১। ২০শে পৌষ। } ভারত।

জেলা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস সমিতির সভাপতি—নেত্রকোণা।

মহাশয়, আমি শুনিতেছি যে, জ্যৈষ্ঠ মাসে আপনাদের শুভ অধিবেশন হইবে। অধিবেশনের বিষয় সম্বন্ধেও সাধারণভাবে যৎকিঞ্চিৎ অবগত হইয়া খুব আনন্দিত হইলাম।

আমরা বৃক্ষতলবাসী সন্ন্যাসী হইলেও লোক সমাজে বাস করা হইতেছে বিধায় দেশের বা সমাজের শুভাশুভের অথবা উন্নতি অবনতির বিষয় সমূহে আকর্ষিত হইয়া সত্য বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনে আমাদিগকে সুখী এবং ইহার অপলাপে দুঃখিত করিয়া থাকে ; অথচ ইহা আত্মার ধর্ম্ম। আশা করি নির্ব্বাচিত বিষয়গুলি পরে অবগত হইতে পারিব।

তবে এমন হইতে পারে যে, আমাদের দ্বারা কাহাও কোন উপকার সাধিত হয়না, তথাপি আমাদের দ্বারা যাহাতে কোন অপকার না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করি। যাহা হউক, এসব অনেক অবান্তর কথা লিখিলাম। এখন মোটামুটি আমার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছি, বোধহয় মনোনিবেশ করিবেন।

আপনাদের যে অধিবেশন বসিবে, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইতে খরচ বেশী না হইলেও কম হইবে না। আর সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জনীয় হওয়াই সম্ভব। তন্মধ্যে দেশের গরীব দুঃখী সাধারণের কিঞ্চিৎ সুবিধার জন্য ৫০০ শত চরকা ও তদনুয়ায়ী তূলার সুবিধা করিয়া দিলে অন্ততঃ ৫০০ শত লোকের স্থায়ী উপকার হইবে। আমার মনে হয় হাজার বারশত টাকা হইলেই চলিবে।

আপনাদের সমাজ দ্বারা যে দেশের একটা দিক রাখিতে হইতেছে বা রক্ষিত হইতেছে এই বিশ্বাস দেশবাসীর যথেষ্ট আছে। বিশেষতঃ এই কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে এমন একটা কাজ হইলে অন্ততঃ সারা বঙ্গ ব্যাপী একটা ধন্যবাদ পড়িয়া-যাইবে। আর বিষয়টি সঙ্গত কি অসঙ্গত ইহা বিবেচনা করা

আপনার করামলকবৎ। আর বিশেষ লিখা নিষ্প্রয়োজন। আশাকরি এই কাজে নেত্রকোণার জয়ধ্বনি উঠিবে এবং দেশবাসীর খুবই প্রীতিবর্দ্ধন করিবে। আমার বোধহয় যে ৫০০ শত চড়কা ও তদনুয়ায়ী তূলার ব্যবস্থা করিতে এই অধিবেশনের ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ টাকার অধিক লাগিবে না।

৩২।৬।১ } আঃ
চিত্রধাম। } ভারত।

কুমুদানন্দের মাতাঠাকুরাণী কে—,

আপনার পত্রখানা পাইয়া বিস্তারিত সমাচার অবগত হইলাম। সন্ন্যাসীর বিবাহ দেশের চক্ষে এক রকমের নূতন ধরণের অপ্রাসঙ্গিক কার্য্যই বটে। কিন্তু তবু দরকার বোধে অধিকারী ভেদে আমি অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না, বরং কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। তাই লিখি, শ্রীমান্ কুমুদানন্দের সঙ্গে বিশেষ আলাপ আলোচনার দরকার। তাহাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন। বিষয়টা ছোট মনে করিবেন না। ইহা গুরুতর সমস্যার বিষয় জানিবেন। এই কার্য্য দ্বারা দেশের বা সমাজের মুখোজ্জলও হইতে পারে, এবং মেয়ে বা কুমুদানন্দের চিরকালের জন্য কলঙ্কও আরোপ হইতে পারে। অতএব এই বিষয় আমাদের ক্ষেত্রের গার্হস্থ্যা-

শ্রমিদিগের মধ্যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

আমি বর্ত্তমান মাসের ৫।৬ই তারিখে কাওরাদই শ্রীমান মুরারিমোহনের বাড়ীতে পৌছিব। সেখানে শ্রীমান অতুল উপেন্দ্রবাবু তাহারাও যাইবে। সেখানে আমি ৪।৫ দিন থাকিব। শ্রীমানকুমুদকে তথায় পাঠাইয়া দিবেন। তখন সকলের সঙ্গে একযোগে পরামর্শ করিয়া লইব এবং ইহাই শ্রেয় হইবে। নচেৎ কেবল আপনি অনুমতি চাহিলেন, আমিও আদেশ দিলাম ইহাতে সামাজিক কার্য্য সম্পাদন হইতে পারেনা। লোকে কথায় বলে দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। ইতি—

চিত্রধাম। ১৩৩২।১লা কার্ত্তিক। } আঃ ভারত

শ্রীমান্ মোক্ষদানন্দ

মনো, আমার লক্ষীয়া আসিতে দেরী হইতেছে বলিয়া অস্থির হইওনা। আমি শীঘ্রই আসিতেছি। শান্তি, রাধানাথ গতকল্য শালিহর গিয়াছে, তাহারাও শীঘ্রই ফিরিবে। লক্ষীয়া যাহারা আছে, আশ্রমের পরিচর্য্যা করিতে যেন ত্রুটী না হয়। পরস্পর শুনিতে পাইলাম, যতীন্দ্র (যোগানন্দ) নাকি সিদ্ধি লাভের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শ্রীমান উমেশ, ধীরানন্দ ও নাকি কর্ত্তব্যের ত্রুটি করিতেছে। ছেলেপিলের পড়ার

দিকে নাকি বিশেষ মন না দেওয়ায় চতুর্দ্দিকের ছেলে-পিলে আসে না। এই সকল নানারূপ দুর্নামেরই কারণ হইতেছে। উমেশ আমার নিকট হইতে যাওয়ার সময় ত্রুটি করিবে না স্বীকার করিয়াছিল। এইসব বিশৃঙ্খলাতে অবশ্য বাক্য পালনের ত্রুটি হয়। ঈশ্বর কি সিদ্ধি করা যায়? তাঁহার কৃপা দ্বারাই সিদ্ধি হয়। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁর আদেশই ঈশ্বরের আদেশ জ্ঞানে পালন করিলেই ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয়। তোমরা মনে রাখিও "যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বরী তাঁরও বাবা আমি।" কারণ আমার আদেশ পালনই তোমাদের সাধন। অর্থাৎ তোমরা যাহারা আমার নিকট আসিয়াছ তাহাদের সিদ্ধি আমার হাতে। যাহা হউক আমার কথায় ও হবে না, তোমাদের ভাবও চাই। কারণ গুরুতে অভক্তি অবিশ্বাস আসিয়া অনেক সাধক লাঞ্ছনা ভোগ করে। আমাকে তোমরা স্বতন্ত্র ভাব আর না ভাব আমার বাক্য ভগবদ্বাক্য। যোগেন্দ্রকে বলিও, তাহার মন যেন চঞ্চল না করে, আমি আসিয়াই বিহিত করিব। এখন মুষ্টি ভিক্ষা স্থগিত রাখিয়া চালাইতে পারিলে ভাল হয়। অবলার নিকট ও বলিয়াছিলাম, তুমিও ছেলেপিলের পড়াশুনা করাইতে পারিলেই ভাল হয়।

১৩২৭। ৭ই মাঘ।
গৌরী-আশ্রম।

আঃ
ভারত।

শ্রীমান্ উপেন্দ্র চন্দ্র রায়—কাঁঠাভলী।

শ্রীমানশঙ্করানন্দের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, গচিহাটা নিবাসী শ্রীমান্ পূর্ণেন্দুর জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। পাত্রটি নাকি শ্রীমৎ কুলানন্দ ব্রহ্মচারীমহোদয়ের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত অথচ উপাসক। তোমার মনোনীত হইয়া থাকিলে অত্যন্ত সুখের বিষয়ই বটে ; কারণ সৎপাত্রে কন্যা দানই তোমার সঙ্কল্প অথচ শ্রেয়, তবে নির্ব্বন্ধের উপর নির্ভর করে। ভগবান করুন যাহাতে সৎ পাত্রে দান করিতে পার তাহাই বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে বিবাহ চলিতেছে, তাহাতে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক ক্ষেত্রের সকলেই সে আলোচনা করিতেছে। কারণ এই যে বিবাহের যজ্ঞটি পর্য্যন্ত পুরোহিতই করিয়া থাকেন। যজ্ঞের মন্ত্রের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে স্বয়ং বরই যজ্ঞক্রিয়ার অধিকারী। ইহার ব্যতিক্রমে অর্থাৎ পুরোহিত যজ্ঞক্রিয়া করিলে বেদাচার মতে বিবাহ অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি পাত্র এই মর্ম্ম অবগত না হন অথবা নিজে যজ্ঞ করিতে অপ্রস্তুত বা অসমর্থ হন, তবে তাহাকে কিরূপে সৎপাত্র বলা যায়—তাহা বিবেচ্য বিষয়। বিশেষতঃ শূদ্রাচারী পাত্র সৎপাত্র হইতে পারে না। গ্রাম-যাজক পুরোহিত দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করাও অশাস্ত্রীয়। এতৎ সম্বন্ধে পাত্র পক্ষের সঙ্গে বা পাত্রের সঙ্গে আলোচনা আবশ্যক, যাহাতে শূদ্রত্ব বা শূদ্রাচার পরিহার করা যায়। এ সবের জন্য যদি বিবাহের ব্যাঘাত ধারণা করা যায়, তবে নির্ব্বন্ধকেও খণ্ডন করা হয়। জনক মহারাজ ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া, দ্রুপদ রাজা

লক্ষ্যভেদ পণ করিয়া, সৎপাত্র নির্ব্বাচনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব, সত্য সংস্থাপন করিতে যাইয়া নির্ব্বন্ধের উপর সন্দেহ আনয়ন করা অজ্ঞতা বই আর কিছুই নয়, ইহাতে ধনী দরিদ্রের তুলনা আবশ্যক করে না। এসব সম্বন্ধে তোমাদের সমাজে বিশেষরূপ আলোচনা আবশ্যক।

শ্রীমান নকুলের ছেলেকে খরচ দিয়া শ্রীমানঅতুলের বা শ্রীমানশশীর বাড়ীতে অথবা তোমাদের বাড়ীতে রাখিয়া বনগ্রাম স্কুলে পড়াইবার সুবিধা হইতে পারে কিনা লিখিবা। গতকল্য রাত্রিতে মা বলিয়াছেন—"বিবাহের মন্ত্র বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা করিতে হইবে"। ইতি—

লক্ষ্মীগঞ্জ। } আঃ
১৩৩২। ২২শে মাঘ। } ভারত।

শ্রীমান যোগেন্দ্রনারায়ণ কারকুণ—জঙ্গলবাড়ী।

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীমতী বাণীর বিবাহ সম্বন্ধে মা বলিয়াছেন—"সে যে রকম ঘরে বিবাহ দিতে ভাল মনে করিতেছে আমি সেরূপ ঘরে দিব না। আমি যে ঘরে ভাল মনে করি তেমন ঘরে দিব। সে (যোগেন্দ্র) এত চিন্তা করে কেন?" সুধীরের মায়েও ডাকিয়াছিল, তাহারও আদেশ হইয়াছে—"আরও পরে বিবাহ হইবে চিন্তা নিষ্প্রয়োজন"।

আমিও দেখিতেছি, অনর্থক মনটাকে অস্থির করিতেছ। কারণ একদিকে আমরা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাবস্থায় সকল প্রকারে

মায়ের শ্রীপদে নির্ভর করিয়া চলিতেছি এবং চলিতে চাহিতেছি। অপর দিকে দার্শনিক হিসাবেও যাহা প্রচলিত সমাজের রীতি, তন্মধ্যে যাহা অসমীচীন তাহা পরিবর্ত্তন করিতেও আমরা প্রয়াসী।

বর্ত্তমান সময়ে প্রাকৃতিক হিসাবে বা মায়ের ইচ্ছায়ই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অনেক মেয়ের ও ছেলের বয়স বেশী হইয়া বিবাহ হইতেছে। অথচ আমারাও দেখিতেছি যে ২০।২২ বৎসর বয়সের মেয়ের সহিত ৩৫।৩৬ বৎসর বয়সের ছেলের বিবাহ হইলে জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু ইত্যাদি দোষ সমূহ ক্রমে অপসারিত হইবে। ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা প্রাপ্ত ছেলে মেয়েদের মিলনই প্রচার্য্য বিষয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত ছেলের বৈষয়িক উন্নতি থাকিলেও ইহা পুরীষ মূত্রের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

পুরাণে পাওয়া যায় যে, রাজার কন্যা ইচ্ছা করিয়া পর্ণকুটীরবাসী সত্যপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ভগবদ্ভক্তকে বরণ করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মানুযায়ী কোন সময়ে সপ্তম অষ্টম বা নবম বৎসর বয়সে মেয়ের বিবাহের প্রথা ছিল, কোন সময়ে ২০।২২ বৎসর বয়সেও মেয়ে বিবাহের প্রথা ছিল।

অতএব লিখি, আমাদের সঙ্গে মায়ের কোন প্রকার শত্রুতা নাই। অথচ তাঁহার উপরই নির্ভর দিয়া যখন চলিতেছি তখন জানিবা যে, এখন যাহা জীবনে ঘটে ইহাই ভবিষ্যতে আদর্শরূপে পরিণত হইবে।

আমরা লৌকিক ভাল মন্দের ধার ধার ধারি না এবং

ধারিবও না। কারণ লৌকিক হিসাবেও কোন কাজ করিতে চাহিলে একদলে ভাল বলিয়া থাকে, আর একদলে মন্দ বলিয়া থাকে, এসব দেখিলে চলিবে না। আজ কালের কত মেয়ে ২০।২২ বৎসরেও অবিবাহিতা অবস্থায় আছে সীমা নাই, আর বাণীর বয়স ত ১৭ বৎসরই, এজন্য চিন্তা আনয়ন করা একেবারে অসঙ্গত মনে করিবা। কেবল মানুষের নিকট বিবাহ দেওয়া কেন? এই মনে করিয়া অদ্য প্রায় ৪।৫ বৎসর হইল শ্রীমান গোবিন্দ তাহার কন্যা সুমতিকে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীজনার্দ্দনের নিকট বিবাহ দিয়াছে। ইতি—

চিত্রধাম।
১৩৩২। ২রা চৈত্র। } আঃ
ভারত।

কয়েকখানি পত্রের শ্রেষ্ঠাংশ

জগতের মূল কারণ আনন্দ। ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত সকলেই কেবল আনন্দই চায়, তবে ভ্রান্তি বশতঃ একাত্মজ্ঞান অর্থাৎ এক আত্মারই যে বিকাশ এই জ্ঞান না থাকায় দেহাভিমানী হইয়া ক্ষণস্থায়ী ধ্বংসশীল দেহাদি জড় পদার্থে নিত্যতা বোধে অর্থাৎ আত্মার নির্গুণত্বে বা নিরাকারত্বে ভ্রান্তি জন্মিলে কর্ত্তা, ভোক্তাদি ভ্রান্তি বোধ আসিলে অকর্ত্তা দ্রষ্টা জ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় ক্ষণস্থায়ী দেহাদি জড় পদার্থে চিরশান্তি লাভের আশায় উপভোগ করিতে যাইয়া ইহার বিনাশে ততোধিক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

"এই যে দাম্পত্য প্রেম ইহা দেহলক্ষ্যে নয়, শুধু আত্মালক্ষ্যে, কারণ মৃতদেহে মানুষের ভালবাসা থাকে না। যতক্ষণ দেহে আত্মার বিকাশ রূপ প্রাণশক্তি বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ তাহার সহিত ভালবাসা বা সম্বন্ধ। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সেই সুখ স্বরূপ আত্মার বিমলানন্দই ইহার মূল কারণ। এই আনন্দভোগের মূল স্থান হৃদয় হইতে নেত্র পর্য্যন্ত এবং হৃদয়েই ইহার সম্পূর্ণ বিকাশ। সুখ হইলেও বুকে লাগে দুঃখ হইলেও বুকে অনুভব হয়।"

"কেবল জাড়ের উপাসনাকেই দ্বৈতজ্ঞান বলে, অর্থাৎ যজ্ঞ ব্রত ও পূজাদি দ্বারা স্বর্গাদি সুখ লাভের কামনায় দেবতাদির যে অর্চ্চনা হয় ইহাই দ্বৈতবাদ।

আর ঈশ্বর অথবা আত্মজ্ঞান লাভের আশায় চিত্তশুদ্ধি বা পাশছেদন অথবা ত্রিতাপ জ্বালা দূর করণার্থ ঈশ্বর, ব্রহ্ম অথবা আত্মার উপাসনাকে অদ্বৈতবাদ বলে। অথবা যে উপায়ে জরা-মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সৃষ্টি লীলার অধিকারী হওয়া যায় বা যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় তাহাকে অদ্বৈতবাদ বলে।

দ্বৈতবাদী বলেন যে, জগৎ নিত্য স্বর্গাদিও নিত্য এবং দেবতার উপাসনা দ্বারা অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়।

অদ্বৈতবাদী বলেন, জগৎ অনিত্য স্বর্গাদিও অনিত্য অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল— ইহা জড়। স্বর্গলাভাদি সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং অদ্বিতীয় চৈতন্যই নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল। জড় চৈতন্যেরই বিকাশ মাত্র, যেমন আমি তুমি বোধ মিথ্যা তেমন, জগৎ বোধও মিথ্যা।

আমি জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অনাত্মা বা দ্বৈতবোধ শব্দটি ভ্রান্তি মাত্র, অর্থাৎ অজ্ঞানের বাক্য। কারণ জ্ঞানীগণ জানেন যে সর্ব্ব ভূতেই আত্মা বিরাজমান। ঋষিগণের দেবার্চ্চনার বিধি করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সূক্ষ্মদেহীগণ মানবকে সৎপথে চলিবার জন্য সাহায্য করিবেন। যেমন আমরা সৎ হওয়ার জন্য গুরু বা সৎলোকের অর্চ্চনা বা সঙ্গ করি, আর অসৎপ্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষকেও আদর করিয়া থাকি। এই সূক্ষ্মদেহীদের মধ্যে দেবতা ও উপদেবতা আছেন, অর্চ্চনাতে ইহারা সন্তুষ্ট হইয়া এই পথে অর্থাৎ সৎ হইবার পথে সাহায্য করেন।

আর এই যে "ধনং দেহি পুত্রং দেহি' বলিয়া অর্চ্চনা ইহা অজ্ঞানের স্বভাব, কারণ ধনজনাদি লাভ কর্ম্মের ফল, অর্থাৎ ইহাদের সাহায্যে সৎভাবে চলিলে জীবিকা নির্ব্বাহার্থে যাহার যতটুকু দরকার তাহার তাহা আসিবেই।"•

"তুমি সেই (আত্মা) তাই অকর্ত্তা। তোমার প্রকৃতি দুই প্রকার, অর্থাৎ দুইটি অপরা (জৈব বা জীবভাব) ও পরা আত্ম-প্রকৃতি বা আত্মভাব। জৈব ভাব দেহগত অর্থাৎ এই দেহের জন্য শোক দুঃখাদি বোধ, ইহা অহংতত্ত্বে (আমি দেহ বোধে) আমি করি বোধে হয়।

ইহার (জীব ভাবের) অর্থাৎ আমি দেহ এইভাব হইলেই এই দেহগত সুখের জন্য কাম, ক্রোধাদি ছয়টি আর নিন্দা ঘৃণাদি বৃত্তি আটটি দ্বারা আত্মভাব আচ্ছাদন করিয়া থাকে। ইহার কারণ আত্মাতে জড় বোধ অর্থাৎ আমি মনেন্দ্রিয় এই বোধ, যতক্ষণ তোমার জ্ঞান থাকিবে যে "আমি চৈতন্য" অর্থাৎ

সাক্ষীস্বরূপ ততক্ষণ উপলব্ধি হইবে যে, আমি দর্শন করিনা, অর্থাৎ ব্যুত্থানে বহির্জগতে কি হইতেছে তাহা আমাতে প্রতিভাত হয় (ছায়া পড়ে, তাহা আমি ঈক্ষণ করি) তাই আমি সাক্ষী বা দ্রষ্টা।

আমি কর্ত্তা নহি, দাস নহি, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার আকাশাদি পঞ্চভূত শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয় ইহার কিছুই আমি নহি। আমি সর্ব্ব প্রকাশক। আমি করিনা এমন কি আমি অনুভূতিও করিনা, আমার অনুভব হয় অর্থাৎ আমাতে প্রতিভাত হয়। তাই আমি নির্গুণ নির্ব্বিকার জ্ঞান স্বরূপ।

আমার পরাপ্রকৃতি শান্ত (সদা সন্তুষ্ট), তাই উগ্রতা নাই। সদা সন্তুষ্ট তাই মাধুর্য্যভাবে হেয় বোধ নাই। প্রতীক প্রতি-মূর্ত্তিতে (জড়ে) আমি সর্ব্বব্যাপী, তাই সর্ব্বভূত চৈতন্য প্রতিভাত হয়। আমি চরাচর ব্যাপী তাই প্রকৃতি আমাকে (আত্মাকে) ভক্তি করে। আমি কিছু করি না। আমার ভাব (প্রকৃতি) সৎ তাই ব্যুত্থানেও ক্ষমাদি গুণ থাকাতে জগৎটাকে পদার্থ দ্বারা অর্চ্চনাদি করিতেও সন্তোষ থাকে।

দয়া দাক্ষিণ্য, ভক্তি বাৎসল্যাদি ভাবই প্রকৃতভাব, তাই ইহাকে পরা প্রকৃতি বলে অর্থাৎ পরাপ্রকৃতি নিত্য অবিনাশী।

অশ্রদ্ধা অভক্তি নিন্দা ঘৃণা ও হিংসাদি ভাব সমূহকে অপরা প্রকৃতি বলে, কারণ ইহা ধ্বংসশীল, অনিত্য, অসৎ।

———o———

পরমকল্যাণীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দত্ত—সিংরৈল

আমি সমিতির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলাম। সমিতির কার্য্য এইভাবে চলিবে না। নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলেই যেন অতি সহজে অল্পায়াসে প্রাচার্য্য বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে প্রচার হইতে পারিবে।

এই সমিতি হইতে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া ব্রাহ্মণেতর সমাজ ও শূদ্রেতর সমাজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল আদি যে সকল সমাজ আছে, সকল সমাজের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিষয়গুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া কিছু কিছু করিয়া মাতৃভাষায় বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলে, একটি পুস্তক দশবার পাঠ করিয়া যাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, পত্রিকা একবার পাঠে তাহা হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব এই যে, শাস্ত্রীয় প্রমাণ-গুলির মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ ক্রমে কোন্‌গুলি কখন কোনভাবে বুঝিলে বা বুঝাইলে কোন্ বিষয়ের অনুকূল হইবে তাহ। অনেক পাঠকই ১০০।২০০ পাতা বই পাঠ করিয়া ভাব গ্রহণে সমর্থ নহেন। হয়ত একটি বিষয় পড়িয়া বাহাবা দিয়া আর একটি বিষয় পড়িতেই পূর্ব্বের বিষয়টি ভুলিয়া গেলেন, এক জনের নিকট বলিতে চাহিয়া আঁকা-বাঁকা করিতে থাকেন। অবশেষে এই বলিয়া থাকেন যে, 'বইখানা খুব ভাল।'

দ্বিতীয়তঃ :—গ্রামে গ্রামে উপর্য্যোপরি সভাসমিতি করিয়া বুঝাইতে গেলে যত কৃতকার্য্য হইতে না পারিবেন পত্রিকা দ্বারা তাহার অনেক বেশী কাজ হইবে, এবং আলোচ্য বিষয়গুলি গ্রামে গ্রামেই লিপিবদ্ধ থাকিবে ও দিন দিনই আলোচনা হইবে। বরং মধ্যে মধ্যে গ্রামে যাইয়া প্রথম প্রথম বিষয়গুলি

সম্‌ঝাইয়া দিতে হইবে। এইভাবে কিছুকাল চেষ্টাতে অনেক ভাল ফল হইবে। অবশ্য সভা করা দরকার কিন্তু খুব কম সভা করিলেই চলিবে।

তৃতীয়তঃ—মাতৃভাণ্ডারের সাহায্যার্থ মুষ্টির ঘট সম্বন্ধে এবং ভাণ্ডারের অনুকূলে অনেক রকম আলোচনা পত্রিকাতেই চলিবে।

চতুর্থতঃ—বিশেষ কাজ এই হইবে যে, সমিতির কর্ম্মচারীদের শাস্ত্রজ্ঞান, সাহিত্যজ্ঞান, লিখার শক্তি, মনের বল, উৎসাহ উদ্যম ইত্যাদি নানারকমেই শিক্ষালাভ হইবে।

পঞ্চমতঃ—আর আমাদের ক্ষেত্রান্তর্গত গ্রামগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচয় সহজেই হইবে এবং অন্যান্য বহুগ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলোচনা করিবার পথ হইবে। এইরূপে প্রত্যেক সমাজ সম্বন্ধে প্রতি পত্রিকাতেই আলোচিত হইলে আশা করা যায় যে, পত্রিকা সকলেরই গ্রহণীয় হইবে। এই পত্রিকা শহরে প্রচার করার উদ্দেশ্য না করিয়া কেবল পল্লীতে প্রচারেরই উদ্দেশ্য থাকিবে।

এখন কথা এই যে, পত্রিকা বাহির করিতে না কি রেজিষ্টারী করিতে হয়, তাহার খরচ কত লাগিবে জানিতে হইবে। আর শাস্ত্রগ্রন্থ—কতগুলি সংহিতা, মহাভারত, ঋক্‌বেদাদি ক্রয় করিতে প্রায় শতাবধি টাকা লাগিবে। আর এক বৎসরের পত্রিকা, বার মাসে বার হাজার পত্রিকা ছাপান কাগজ ইত্যাদির খরচও মোটামুটি ৬০০৲ টাকা। এই একুনে যাহা হইবে তন্মধ্যে ছাপান খরচ ক্রমে লাগিবে। যেমনেই হউক আমার বিশ্বাস যে বৎসর অন্তে পত্রিকার খরচের অর্দ্ধেক হইলেও পত্রিকা হইতেই উঠিবে।

শ্রীযুক্তদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা অথবা তাহার পুস্তকগুলি দ্বারা আমাদের খুব উপকার হইতেছে এবং হইবার আছে। কিন্তু তাহার বইগুলি বিক্রী করিয়া তাহার ঋণ আদায়ের সাহায্য করিয়া আমাদের প্রচারক করার জন্য চেষ্টা—ইহা কিছু কিছু করিয়াই ভাল। কারণ এই, তাহার বই গ্রামে গ্রামে থাকিলে কিম্বা বক্তৃতায়ই কেবল কাজ শেষ নহে—ইহার মধ্যে আপনাদেরও অনেক কাজ আছে ও থাকিবে। এই বইও বিক্রী হউক আপনাদের স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করুন।

এইভাবে প্রচার করিলে সমিতির আয় ব্যয় সম্বন্ধে অন্ততঃ এই ক্ষেত্রের লোকের নিকটও বলিতে পারিবেন। আর সকলেই খুব উৎসাহিত হইবে, কর্ম্মচারীদের বেতনাদি সম্বন্ধেও সুবিধা হইবে। শাস্ত্রবাক্যগুলি দুই স্থানে বসাইতে হইবে, জাতিভেদে ও ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহারগুলি—যেমন শূদ্রান্ন পলাণ্ডু ভক্ষণ প্রভৃতি অনেক আছে। যদি ভাল মনে করেন তবে রেজেষ্টারী করার কথা সম্বন্ধে ছাপাখানার ম্যানেজারের নিকট জানিয়া বা যেখানে জানিতে হয় জানিবেন। তদনুসারে টাকা যাহা লাগিবে তাহাও সংগ্রহ করা চাই। এই বাবতে কত টাকার দরকার তাহা মোটামুটি বরাদ্দ করিবেন।

হাসামপুরের সমাজবিভ্রাট সম্বন্ধে আমি মনে করিয়াছিলাম যে একটি নিবেদন পত্র লিখিয়া সেই অঞ্চলে গ্রামে প্রচার করি, চিঠিখানা পাঠাই, বিবেচনা করিবেন। দরকার মনে করিলে জানাইবেন। এই যে পত্রাদি ছাপাখানায় দিয়াছেন—পত্রিকা বাহির হইলে অতি সহজ হইবে।

উপনিবেশের জন্য যাহা আদেশ হইয়াছে—তাহা এখনও ধরিতে পারি নাই। তাই তাহাদিগকে শ্রীহট্ট পাঠাইতেছি, সুনামগঞ্জের দিকে অনেক ভাল স্থান আছে, এখানেই মান্দাই-দের নিকট জানিলাম। তাহারা অনেকেই যাইবে ও গিয়াছে। স্থান প্রচুর এবং ইহারা এক বৎসর যাবৎ বাস করিতেছে। স্থানটা গৌরীপুরের জমিদারের। তৎসংলগ্ন আর একটি স্থান হরিপুরের একজন সাহা জমিদারের, বিনা নজরে তিন বৎসর পাইল যাহা পাওয়া যায়—তাহাতেই অনেক টাকা লাগে।

১৩৩২।২৮।৮ } আঃ
কাওরাইদ। } ভারত।

পরমকল্যাণীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দত্ত—সিংরৈল।

বাবা, গত পরশ্বদিবস যামিনীর একখানা চিঠি ও গতকল্য আর একখানা চিঠি পাইয়া অবগত হইলাম। গত কল্যকার শ্রীমৎ দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কার্ডখানায় অবগত হইলাম যে তিনি আপনার ও অশ্বিনীর চিঠি পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়াছেন। আর আরও ২০০৲ টাকার বই পাঠাই-য়াছেন। তিনিও সিরাজগঞ্জ আসিয়া এদিকেও আসিবেন লিখিয়াছেন। মোটকথা তিনি আপনাদের উৎসাহ উদ্যমে সত্যটাকে খুব ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার আনন্দ হইয়াছে।

এদিকে আমার এই কার্য্যটিকে বিরাট মনে করিয়া এবং কর্ম্মীর অভাব, অর্থের অভাব, সহযোগিতার অভাব দেখিয়া

ও তন্মধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার অবস্থা দেখিয়া আপনাদের মনে নিরাশের ভাব আসিয়াছে। এমন নিরাশভাব আসিতে যে পারে তাহা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ দেশের ও সমাজের উচ্চশ্রেণীর বড় লোক যাঁহারা আছেন, ইহারা মুক্তকণ্ঠে নানা-রূপ অকাট্য যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, ইহা একেবারেই অসম্ভব, কিছুতেই হ'বে না। সেদিন নাকি দিগ্‌দাইর নিবাসী শ্রীযুক্তরমণীবাবু বলিয়া গিয়াছেন যে ইহা একেবারে অসম্ভব এবং আপনাকেও নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে অসত্য অন্যায় পথ তাহার তিনি যুক্তিপ্রমাণ দিতে পারিবেন না। আর তিনি কেন, এমন লোক পৃথিবীতেও নাই। তবে তিনি ইহা বলিতে পারেন যে, ইহার পিছনে এমন একটি শক্তি দেখিতেছি না যে, এত বড় সমাজে ইহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে সমর্থ হওয়া যাইবে। তবে তাঁহার এই কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে পারিব না যে, বাংলার সাধুদিগের দ্বারা দেশের খুব ক্ষতি হইয়াছে। বরং বাংলার বহুস্থানে হিন্দু সমাজের অন্য প্রদেশের ন্যায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা কম হইতেছে।

এই যে অবনী রায়! এখন তিনির যেমনই হউক, তাঁহা দ্বারা এই অঞ্চলের সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকগুলি অনেক আনন্দ উৎসাহ ও একতায় উন্নত হইয়াছে। স্বামী দয়ানন্দ! (ঠাকুর দয়ানন্দ)—ইনিয় কীর্ত্তন প্রচার ও আচণ্ডালে সমতা (এক পংক্তি ভোজনাদি করা)—দেখিয়া নিম্নশ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীর ম্লেচ্ছাচারী শিক্ষিত সমাজও সত্যপথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধুর কীর্ত্তন ও

অসাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে সে অঞ্চলের অন্যান্য সমাজের সঙ্গে সঙ্গে বনুয়া বাগ্‌দী অশিক্ষিত সমাজগুলিকে কত রকমে উন্নত করিয়াছেন তাহা অবর্ণিত। মোট কথা এইরূপভাবে খণ্ড খণ্ড ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের দ্বারা দেশের যত কাজ হইয়াছে বা হইতেছে, এরূপ কাজ করিতে দাম্ভিক শিক্ষিত সমাজের অনেক যুগ বা অনেক জন্ম লাগিবে। আমার কথাগুলি আপনি খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। কিন্তু ইহা খুব ঠিক যে, ইঁহাদের প্রভাবে গোড়া হিন্দু সমাজের অবিধিযুক্ত গোঁড়ামির প্রভাব খুব তুর্ব্বল হইয়াছে। এই প্রকার পুস্তক প্রচার ও পত্রিকা প্রচার ও অশিক্ষিত সমাজের এবং শাস্ত্রানভিজ্ঞ শিক্ষিত অব্রাহ্মণ সমাজের অনেক শিক্ষা হইয়াছে, সাহস বল বাড়িয়াছে। এখন চিন্তা করিয়া দেখেন যে, কি ছিল আর কি হইয়াছে। আর আমিই দেখিলাম গীতা ভাগবৎ আদি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ পাঠ করিতে পারিত না। এখন তাহাতে অধিকার হইয়াছে। সেদিনের কথা—কেন্দুয়ার নিকট আমতলা গ্রামের দশরথ নামক একজন নমশূদ্রকে পূজার্চ্চনার বিধি দিয়াছিলাম। সে বাড়ীতে মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া ঘণ্টাবাদ্য করিয়া পূজা করিত বলিয়া এতবড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গ্রামের ব্রাহ্মণগণ তাহাকে কত প্রকার নির্য্যাতন করিয়াছেন। আর এখন সে আনন্দের সহিত উচ্চ উচ্চারণ প্রণবের সহিত পূজাদি করিতেছে, এখন সমাজ নীরব। এই সব অনেক কথা!

এখন আমার কথা এই যে, তুর্ব্বলতা আসা দোষ বা পাপ নহে। কারণ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনেরও যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ হেন উপদেষ্টা, সারথী থাকা সত্ত্বেও তাহার তুর্ব্বলতা আসিয়াছিল।

যাঁহাকে হিন্দু সমাজ পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ রাম বলিয়াছেন, সীতা উদ্ধারকল্পে তাঁহারও পুনঃপুনঃ কত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তবে তাঁহারা বিষয়টিকে সত্য জানিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া সফলতা লাভ করিয়া জগতে অজেয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে যদি এরূপ কেহ মনে করেন যে, তিনি অবতার, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি সহায় ছিলেন। এস্থলে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, যাহা সত্য তাহা পালন করিতে যিনিই বদ্ধপরিকর হইবেন বা পালন করিবেন, তাঁহার পশ্চাতে অর্থাৎ সেই কার্য্যের পশ্চাতে সেই সত্যস্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তি সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন এবং করিয়া থাকেন। ইহা সত্য সত্য ত্রিসত্য বলিলাম।

তবে ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে, অমাবস্যায় বা তার পর দিবসেই ষোড়শকলা বিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় না, রাত্রিতে সূর্য্য প্রকাশিত হয় না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকেও নাগপাশের বন্ধন দশায় পতিত হইতে হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রতীরে বাসা করিতে হইয়াছিল। যীশুখৃষ্ট—শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার সত্য গ্রহণ করিবে দূরের কথা বরং তাঁহার ক্রোশে বিদ্ধ হইয়া দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ সত্য প্রচারে বাধাবিঘ্ন অনেক উপস্থিত হইয়া থাকে। জ্ঞানীগণ বলেন বিরুদ্ধ শক্তি জাগিলেই কার্য্যের পুষ্টি সাধন হয়।

এখন আমাদের ঘরানা কথা লিখিতেছি। মনোযোগের সহিত গ্রহণ করিবেন। ইতিপূর্ব্বে আপনার লিখিত চিঠি খানার সমর্ম্ম উত্তর না দেওয়ার কারণ এই, শ্রীমান উপেন্দ্র

এখান হইতে যাওয়ার কয়েকদিন পর হইতেই আমার শরীর নূতন সর্দ্দিতে খুব খারাপ হইয়াছিল। এই অসুস্থতা ছাড়িতে প্রায় ১০।১২ দিবস লাগিয়াছিল। এই কয়দিন আমার এখানে অন্য কেহ ছিল না তাই তৈলও নিজে দিতে পরিশ্রম বোধ হইত। অতএব পত্র লিখিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম। তবে আমার লিখিত পত্রে আপনার লিখিত এই পত্রেরও কয়েক বিষয় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস লিখা হইয়াছিল, খুব তাড়াতাড়ি লিখা হয়। কারণ চিঠি লিখা হইয়াছে পর সন্ধ্যার সময় পোষ্টম্যান আসিল, তাহার নিকট লিখা চিঠির সঙ্গে ১।২টি বিষয় খুব সংক্ষিপ্তভাবে তিরিংবিরিং করিয়া লিখিয়াছিলাম। আর নামের তালিকা সম্বন্ধে ভাবিলাম, পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছিলাম যে, আমরা বাহির হইয়া গ্রামে গ্রামে গেলেই খুব সুবিধা হইবে। আপনি লিখিয়াছিলেন—১০০ লোক মাতৃভাণ্ডারের সাহায্যকারী দরকার, তবেই কাজ আরম্ভ করা যায়, অর্থাৎ আপনার এই ভাব। আমি আপনার পরের চিঠির উত্তর দিতে পরিশ্রম বোধ করিয়া ভাবিলাম যে, শরীরটা সুস্থ হইলে পরে লিখিব। আজ ৬।৭ দিন হইল কাশ্মীর, উধমপুর হইতে শ্রীমান মোক্ষদানন্দ আসিয়াছে। মনমোহন পূর্ব্ব নাম। সে আসিয়া তৈলটা মাথায় দিতেছে বলিয়া ২।৩ দিন যাবৎ কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হইতেছে। ইতিমধ্যে শ্রীমান্ যামিনীর চিঠি পাইলাম।

আমি মাঘ মাসের প্রথম ভাগেই এস্থান হইতে বাহির হইব। প্রথম লক্ষ্মীয়া যাইতে হইবে। তৈল ও চব্যণপ্রাশ সঙ্গে রাখিব। পরে ক্রমে নানাস্থানেই যাইব। সেই কায়দা মতে আপনাদের এখানেও যাইব। আপনার বহু

কার্য্যাবল্য তাহা আমি জানি; তাই লিখি আপনার নিকট সমিতির যে সব ভার পতিত হইয়াছে তাহাতে আপনার বিশেষ অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ আমি বাহির না হইলে কাহারও দ্বারা সমিতি গঠন হইবে না। আপনি আমাকে সম্প্রতি এই সাহায্য করেন যে, আপনার সম্ভবমত ও সাবকাশ মত যাহা করিতে পারেন তাহাই করিবেন। অর্থাৎ কোন স্থানে যাইবার সুবিধা পাইলে যাইবেন। আর সমিতি হইতে আপনার নাম কাটিবেন না। আমি সব কাজ করিব। তবে কয়েকদিনের জন্য অশ্বিনীকে আমার সঙ্গে রাখিতে দিবেন। মনে রাখিবেন সমিতির কাজে আপনার যে সম্পূর্ণ অনুমোদন রহিয়াছে তাহা আমাদের সকলেই যেন বুঝিতে পারে। অর্থাৎ সমাজ সম্বন্ধে আপনি যাহা সত্য বুঝিয়াছেন, তাহা নিজে যেন পালন করেন। বরং অন্যকে পালনের জন্য যত খাটুনি তাহা আমি করিব। যামিনীরও কার্য্যাবল্য, তাহারও এই কথা—যতদূর পারে সাহায্য করুক। আর নিজে যাহা সত্য বুঝিয়াছে তাহা পালন করিলেই আমার যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

আমি পত্র দ্বারা আমার ভাব সম্যক জানাইতে পারিলাম না। সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয় প্রকাশ করিব। আর এই পত্র পাঠ যামিনীকে পাঠাইলে তাহার নিকটও বলিয়া দিতে পারিব। বইগুলি বিক্রীর জন্য আমি নিজে খুব যত্ন নিব। যে আবেদন পত্রগুলি ছাপান হইয়াছে ইহা হইতে আপনার নাম কাটিয়া দিবার জন্য রমনীবাবু কেন যে আপনাকে অনুরোধ করিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

ইহাতে সত্যের কোন অপলাপ হইতে দেখি না। আর কেবল নাম থাকিলে সাংসারিক কোন ক্ষতি হওয়ারও কারণ নাই। কেবল এই মাত্র ক্ষতি দেখিতেছি যে, শিক্ষিত দুর্ব্বল সত্যের অমর্য্যাদাকারী লোকে নিন্দা করিবে। আবার দেশের উচ্চ শিক্ষিত সত্যের মর্য্যাদা রক্ষাকারী বহু দেশহিতৈষী অতিমানব আছেন, তাঁহারা ততোধিক ভাল বলিবেন। যাহা হউক বরং সম্প্রতি এই পত্র প্রচার বন্ধ থাকুক, আর ইহাতে আপনার কি মত তাহা জানাইবেন। * * *

শ্রীমান্ মুরারি ইতিপূর্ব্বে কাঁঠালতলি তার পূর্ব্ব বাড়ীতে ১০।১২ দিন ছিল। গতকল্য সেই দান-পত্রের মুসাবিদা করাইবার জন্য ঢাকা গিয়াছে। ইতি—

১৩৩২।১২।৯ কাওরাইদ। আঃ ভারত।

পরমকল্যাণীয় শ্রীমান্ যামিনী—সিংরৈল।

তোমার স্বপ্নগুলি অবগত হইলাম। ভালই দেখিয়াছ। আমাদের অনুকূলে প্রায় স্বপ্নই পাইলাম। তবে প্রতিকূলে যাহা দেখিতেছ তাহাও অনুকূলই বুঝিতে হইবে। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি না থাকিলে লীলা পুষ্ট হয় না। যাহা হউক আমার আসিতে গৌণ হবে বরং পূজা তোমরা সম্পাদন কর। তোমার দাদা অন্য লোক আহ্বানের মত করে না যখন, এবার কেবল নিজে নিজেই সারিয়া লও। পূজা নিজে করা চাই। আর বিশেষ সেই চিঠিখানাতে পাইবা। ইতি—

১৩৩২।২২।৯ আঃ—
কাওরাইদ। ভারত।

পরিশিষ্ট

কর্ত্তব্যোপদেশ

পদ্মাসনে বসিয়া মস্তক ও মেরুদণ্ড সরলভাবে রাখিয়া গুহ্য খুব আকুঞ্চন করতঃ জিহ্বাগ্র উল্টাইয়া তালুমূলে স্থাপন করিবে। ইহাই উপাসনায় বসিবার নিয়ম।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগিয়া কয়েকটি আসন ও মুদ্রা করিবে। পরে কোন কোমল আসনের উপর বসিয়া নাসিকার অগ্রভাগে বা সম্মুখস্থ কোন প্রতিমূর্ত্তিতে অথবা কোন চিহ্নিত স্থানে কিয়ৎকাল ধ্যান করতঃ মন একটু জমাট হইলে নাড়ীশুদ্ধি করিবে। পরে বাম হাত নাভিদেশে ও ডানহাত হৃদয়ে রাখিয়া কুম্ভকে "ব্রহ্মগায়ত্রী" ও "মূলমন্ত্র" জপ করতঃ প্রাণায়াম করিবে। তৎপর কিছুক্ষণ নাভিধ্যান করিয়া অন্যান্য কাজে প্রবৃত্ত হইবে। প্রাতঃসন্ধ্যার ক্রিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সম্পন্ন করিবে।

মধ্যাহ্নে আসন ও মুদ্রা ব্যতীত উপরোক্ত নিয়মে উপাসনা করিবে। উপাসনার সময় না পাইলে কেবল "ব্রহ্মগায়ত্রী" জপ করিবে, কিন্তু আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া উপাসনা না করা পাপ।

সায়ংকালে সাংসারিক কাজ সমাপনান্তে পঞ্চাঙ্গ (কনুই হইতে হস্ত পর্য্যন্ত দুই হাত, হাঁটু হইতে পদতল পর্য্যন্ত দুই পা, ঘাড় সহ মুখ চোখ নাক কান ও কপাল) ধৌত করিয়া যথানিয়মে কয়েকটি আসন ও মুদ্রা করতঃ উপাসনাদি করিবে এবং সারাদিন মনের গতি কেমন রহিল,

অর্থাৎ সৎকার্য্যের ভিতর দিয়া কতদূর অগ্রসর হওয়া গেল, তাহা মনোযোগের সহিত ভাবনা করিবে।

রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ধূপ-দীপ সহ যথারীতি জপ ও প্রাণায়ামাদি করিয়া প্রণবে হাজার বার ডাকিবে (মনে মনে উচ্চারণ করিবে)। পরে নাসিকার অগ্রভাগে ধ্যান করিতে করিতে অজপায় মনের লয় করিতে চেষ্টা করিবে। এই সময়ে অধিকারী ভেদে উপাসনানুসারে নানা রকমের ধ্যানও করিতে হয়। দিবসের মধ্যে ইহাই উপাসনার খুব প্রকৃষ্ট সময়।

বিধি আছে যে, একদিন একাসনে পাঁচ হাজার মূলমন্ত্র, অন্যদিন একাসনে দশ হাজার ব্রহ্মবীজ (প্রণব) ও তৎপর নব্বই দিনে একলক্ষ ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিলে মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়, অর্থাৎ ঐকান্তিক ভাবে মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় স্বপ্নে বা জাগ্রতে দর্শন বা আদেশ লাভ হয়। এইরূপ জপের নাম পুরশ্চরণ। যে পর্য্যন্ত দর্শন বা আদেশ লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইল না বুঝিতে হইবে।

যাহাতে শ্রীভগবানে পূর্ণ নির্ভরতা আসে, তজ্জন্য সমস্ত দিন সাংসারিক কাজ করিতে করিতে যথাসাধ্য ইষ্টমন্ত্র জপ এবং "মাগো, বাবাগো, আমাকে কৃপা কর, অপরাধ ক্ষমা কর, পাপতাপ দূর কর, ভক্তি দাও, আমার দেহ-মন-প্রাণ তোমার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করাও ও গ্রহণ কর" এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ইহাতে মন্ত্র পুরশ্চরণের কার্য্য অর্থাৎ মন্ত্রের চৈতন্য প্রকাশিত হইয়া উপাসকের ভগবদ্-ভক্তির শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিবে।

শ্রীভগবানের কৃপালাভের জন্য এবং উপাসনার বিশেষ অবলম্বন স্বরূপ প্রতি বাড়ীতে অভীষ্ট-দেবতার "আসন" স্থাপন করিয়া যথাসম্ভব পূজার্চ্চনাদি করিবে। উচ্চাধিকারী হইলে ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ

করিবে। কিছুদিন পূর্ব্বেও প্রতি বাড়ীতে মা মহালক্ষ্মীর আসন স্থাপিত ছিল, কালক্রমে সেই আসন "মধ্যমপালা"রূপে পরিণত হইয়াছে।

ভোগের সময় গড়াগড়ি দিয়া "শ্রীশ্রীগুরুগীতা" (গুরুস্তুতি) পাঠ করতঃ হত্যায় থাকিয়া সেবা গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিবে। সেবা গ্রহণের আভাস না পাইলে হত্যা হইতে উঠিবে না। যদি কোন দিন আভাস না পাওয়া যায়, তবে অপরাধ ভঞ্জনার্থ বিশেষ ভাবে জপ ও প্রার্থনাদি করিবে। যাঁহারা ভোগ না দেন, তাঁহারা দিবসে একবার হইলেও "গুরুস্তুতি" পাঠ বা শ্রবণ করিবেন। ইহাতে নিজের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি লুপ্ত হইয়া নির্ম্মল জ্ঞান ও নির্ম্মলা ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

সত্যবাক্য অর্থাৎ আবশ্যকীয় বাক্য ভিন্ন অযথা বাক্যব্যয় করিবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি কীটান্থ পর্য্যন্ত যত নাম ও রূপ, সমস্তই এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ভাবিয়া হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলকে সমভাবে ভালবাসিবে।

ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে সুখ দুঃখ নিন্দাস্তুতিতে অবিচলিত থাকিয়া শান্তি, দয়া, সমতা, সরলতা ও নিস্পৃহতা প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণ সকল সহায় করতঃ সত্যরক্ষার জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইলেও তজ্জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে।

যাহাতে ইষ্টভক্তির ব্যাঘাত জন্মে, অথবা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। কাহারো দ্বারা কোনরূপ আঘাত বা দুঃখ যন্ত্রণা পাইলে, নিজ হাতে নিজ হাত কাটার ন্যায় মনে করিয়া আপনার অজ্ঞাত দুঃষ্কৃতিবোধে অপরাধ ক্ষালনার্থ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে।

আবশ্যকীয় কার্য্যকাল ভিন্ন অন্য সময়ে ভগবদ্ভক্তির উদ্দীপনার জন্য ভগবৎ প্রসঙ্গে কাল কাটাইবে।

নিজের দোষ সংশোধন করিবে ও অপরের গুণ গ্রহণে যত্নবান হইবে। নিজের অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশীর বিশেষ অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে আপনা হইতেই সার্ব্বজনীন ভালবাসা বা বিশ্বপ্রেম আসিবে।

কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার না করিয়া অথবা কর্ম্মফলে স্পৃহা না রাখিয়া, নিজের ভোগবিলাসের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কেবল সদুদ্দেশ্যে কর্ত্তব্যবোধে যাবতীয় কর্ম্ম সমাধা করিবে ; ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।

পুরুষ কি মেয়ে কাহারো চক্ষে চক্ষে চাহিবে না। আবাল-বৃদ্ধ-যুবা কাহারো সঙ্গে কোনরূপ তুচ্ছার্থক বাক্য প্রয়োগ করিবে না।

ব্রহ্মচর্য্য এমনভাবে রক্ষা করিবে যে, বিবাহ হইলেও যে কয়েকটি সন্তান হইবে, ততদিনের অধিক বীর্য্যক্ষয় না হয়।

এই নিয়ম লঙ্ঘনে, সতীর সতীত্বের শক্তি ক্ষয় হেতু আয়ুক্ষয় ও লক্ষ্মীনাশ হইয়া অশেষবিধ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

প্রত্যেকেই কায়ক্লেশে প্রতিমাসে চার পাঁচটি ব্রতোপবাস করিবে এবং পরিবারস্থ সকলকেই অভ্যাস করাইবে। ইহা সংযমের খুব সহায়।

ভগবৎ প্রসঙ্গে বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা করিবে না। মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিবে না।

অধিক আহার ও নিদ্রা উপাসকের উপাসনার বিশেষ অন্তরায়। স্মরণ রাখিবে যে, প্রসাদ পাওয়ার সময় কয়েক গ্রাস কম পাইয়াই দেহকে কর্ম্মোপযোগী রাখিতে হইবে, বিশেষতঃ ভরা পেটে রাত্রির উপাসনা চলে না।

ঘুমাইবার ইচ্ছা করিয়া ঘুমাইবে না, ঘুম মনের বিশ্রাম মাত্র। তমোগুণী অসাধকেরাই বেশী ঘুমাইতে চায়। একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে করিতে মনের যে বিশ্রাম আসিবে, তাহাতেই ঘুমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

ভবিষ্যতের কোন প্রয়োজনীয় কাজ মনে মনে পছন্দ করিয়া করিবে না। পূর্ব্বে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনাদি করিয়া স্বপ্নাদেশ বা বাক্যাদেশ পাইলে তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। এইরূপ আদেশ লাভ ও প্রতিপালনে আপনা হইতেই আত্মসমর্পণ আসিবে, নচেৎ বঞ্চনা-শঙ্কা। এমন কি পূর্ব্বকালীন রাজন্যবর্গের অনেকেই এইরূপ ভগবদাদেশে ও তাঁহাদের গুরু ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের উপদেশ অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করিতেন।

গুরুবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস ও তাহা অবিচারে প্রতিপালন করিবে, কারণ তোমার অজানা পথ বলিয়া গুরুই একমাত্র পথ প্রদর্শক।

——

সন্ন্যাসীদের বিশেষ কর্ত্তব্য

১। উপাসনা করিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে যেখানে থাকিবে সেখানেই উপাসনা করিবে। অন্য সময়ে জগদ্‌ব্রহ্মের সেবা (মাতৃভাণ্ডারের কাজে সাহায্য) করিবে।

২। কেহ মৌনাদি অবলম্বন করিয়া নিবিষ্ট ভাবে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিলে, কোন শ্মশানে বা বৃক্ষতলে একাকী বসিবে, আশ্রমে থাকিলেও একাকী থাকিবে।

৩। রাত্রিতে উপাসনার পর একান্ত মনে প্রার্থনা করিবে—"কাল সেবার কি হইবে।" স্বপ্নাদেশ কি বাক্যাদেশ পাইলে তদনুযায়ী কাজ করিবে। দৈবাৎ আভাস না পাইলে হত্যায় থাকিয়া উপাসনা ও প্রার্থনাদি করিবে। কেহ ভোগাদির জন্য কিছু দিলে ভগবদিচ্ছা জানিয়া প্রয়োজন বোধে গ্রহণ করিবে।

৪। যখন যেখানে থাকিবে, ভোগের সময় গড়াগড়ি দিয়া গুরুস্তোত্র (শ্রীশ্রীগুরুগীতা) পাঠ করতঃ হত্যায় থাকিয়া সেবা গ্রহণের জন্য অনেকক্ষণ প্রার্থনা করিবে। ইহাই ভগবৎ কৃপালাভের অতি সহজ উপায়।

৫। দেহরক্ষা বা জগদ্ব্রহ্মের সেবার জন্য প্রার্থনা করতঃ আদেশ পাইয়া অত্যাবশ্যকীয় জিনিসাদি সংগ্রহ করিবে।

৬। কাহারও বাড়ীতে বা দেবালয়ে শ্রদ্ধা হইলে ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করিবে।

৭। কাহারও বাড়ীতে গেলে ইচ্ছা পূর্ব্বক ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিবে না, কেহ নিতে চাহিলে বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় যাইতে পারিবে।

৮। কীর্ত্তনাদি ব্যতীত অন্যসময়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ আসনে স্বতন্ত্র ভাবে বসিবে। কোন উচ্চ আসনে বসিবে না।

৯। কাহারও বিশেষ অনুরোধে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিবে, নচেৎ কোন বৃক্ষতলে, দেবালয়ে, বাজারে বা শ্মশানের ঘরে অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে আপন "আসন" স্থাপন করিবে। দরকার হইলে কয়েক বাড়ী ভিক্ষা করিয়া ভোগ দিবে।

১০। সর্ব্বদাই অহঙ্কার শূন্য হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিবে।

১১। হরেকৃষ্ণ, নারায়ণ, জয় শিবশম্ভু, সীতারাম, হরিবোল—শ্রীভগবানের এরূপ কোন নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-সজ্জনদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদির সহিত আপ্যায়িত করিবে। দেবালয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ধূলি ও চরণামৃত গ্রহণ করিবে।

সমাপ্ত